নিঃসঙ্গ পাহিন

জাহানারা ইমাম

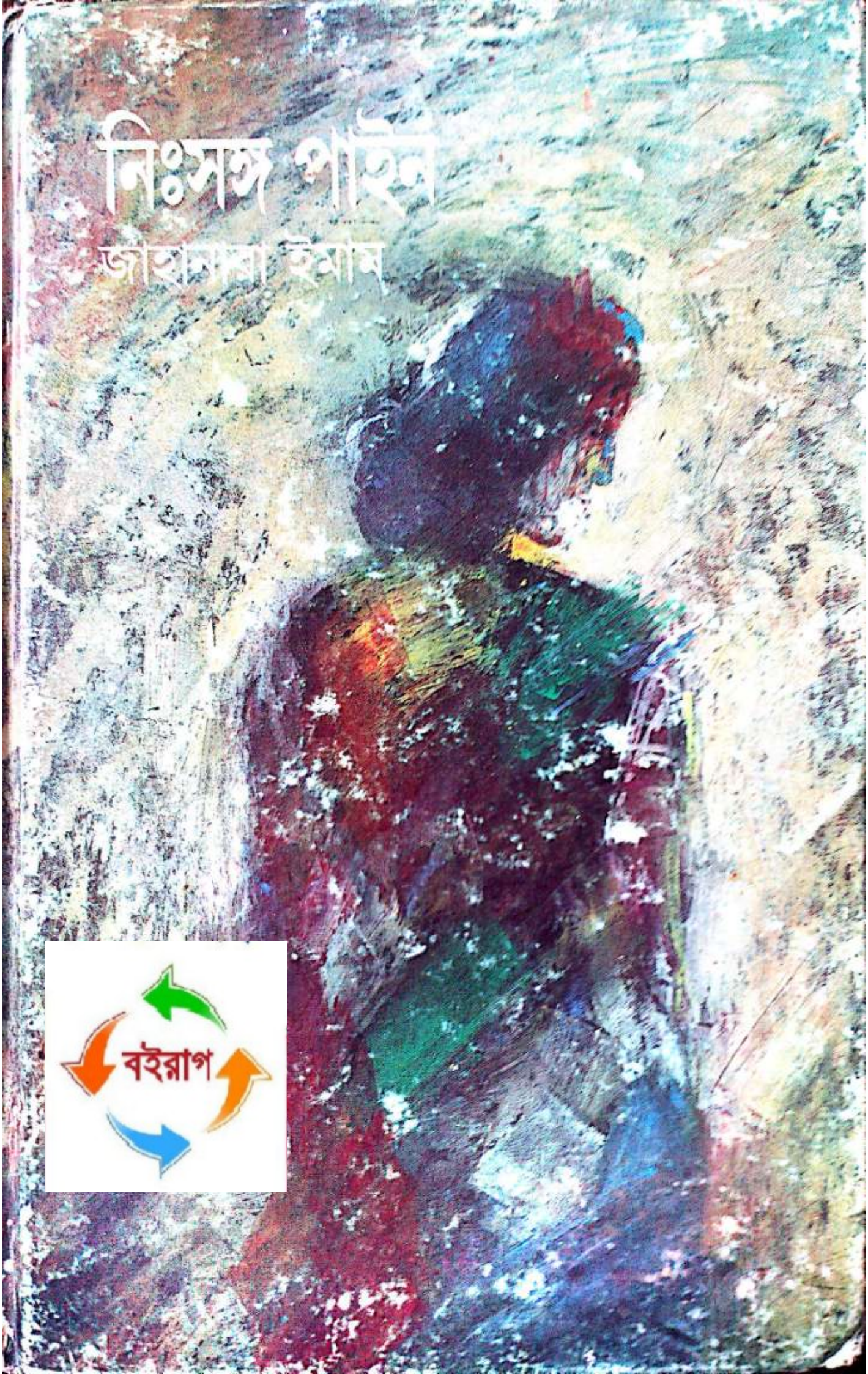

বইরাগ

প্লেনটা চলেছে তো চলেছেই। মনে হয়, অনন্তকাল ধরে চলেছে। গতকাল ঢাকায় রাত আটটার সময় সে প্লেনে উঠেছে। আজ লন্ডন টাইম সকাল নটায় যখন হীথরো বিমান বন্দরে নামল, তখন তার হাতঘড়িতে বাজে ঢাকার সময় দুপুর দুটো। স্থানীয় সময় ধরলে তেরঘন্টা কিন্তু পাক্কা আঠারো ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। প্লেন ওড়ার সময়ের হিসেবে শুভংকরের ফাঁকি। এই মজাটা বোঝার জন্যই সে তার ঘড়ির কাঁটা ঘোরায়নি। ঢাকায় মেজোভাই বলে দিয়েছিল। হীথরোতে কানেকটিং ফ্লাইটও দেরীতে ছেড়েছে। এগারোটার বদলে দুপুর একটায়। মানে ঢাকা-টাইম সন্ধ্যা ছ'টা।

একটু আগে পাইলটের গমগমে গলায় ঘোষণা শোনা গেছে ঃ এখন আমরা আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে বস্টনের কাছাকাছি এসেছি। এখন এখানকার সময় দুপুর দুটো।

দুপুর দুটো! লণ্ডন-টাইম দুপুর একটায় প্লেন ছেড়ে ৬ ঘন্টা উড়ে আসার পরও এখন বস্টন টাইম দুপুর দুটো! সাকিনা কব্জি উল্টিয়ে ঘড়িটা দেখল—এখন বাজে বারোটা। অর্থাৎ ঢাকার রাত বারোটা। তার মানে, সে আটাশ ঘন্টা আকাশপথে রয়েছে। হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠল তার। মাথাও ঘুরতে লাগল। জোরে দুই চোখ বন্ধ করে সীটটা পেছনে হেলিয়ে দিল বোতাম টিপে। জীবনে এই প্রথম তার দূরপাল্লার প্লেনে চড়া। তার ওপর পাঁচ মাসের অন্তসত্ত্বা। এত দীর্ঘ সময় সীটে বসে থেকে পিঠ, কোমর, উরু সব টনটন করছে! সীট থেকে উঠে চলাচলের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে তার লজ্জা লাগে। যদিও খেয়াল করেছে, অনেকে তাই করছে। দু'একবার বাথরুমে যাবার সময় যা একটু হাঁটাচলা হয়েছে।

অনেকক্ষণ জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে সাকিনা একটু সুস্থির হল। আর কতক্ষণ? পাশ দিয়ে এক বিমানবালা যাচ্ছিল, তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ডেট্রয়েট ক'টার সময় পৌঁছোব?'

সে ঘড়ি দেখে মনে মনে একটু কি যেন হিসেব করে বলল, 'আর তিন

ঘন্টা পরে।'
'তখন ডেট্রয়েট-টাইম কটা হবে?'
'বিকেল পাঁচটা।'
সাকিনাও ঘড়ি দেখে হিসেব করল, তখন বাংলাদেশ-টাইম হবে ভোর চারটে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার সময়ের তফাৎ দশ থেকে এগারো ঘন্টা। গ্রীষ্মকালে দশ, শীতকালে এগারো। এগুলো তাকে মেজ ভাই-ই শিখিয়েছে। সে কোনদিনও এ সবের হিসেব জানত না। জানবার কথা মনেও হয়নি। কোনদিন কি ভাবতে পেরেছিল আমেরিকা-প্রবাসী কোন ছেলের সাথে তার বিয়ে হবে? বাপ-মা, ভাইবোন, সুলতানপুরের পুকুর, ঢাকার ক্যাম্পাস, রোকেয়া হল, শহীদ-মিনার, বাংলা একাডেমী, রমনা-বটমূল—সব ছেড়ে সাত সাগর তের নদীর পারে অচেনা দেশে ঘর বাঁধতে যাবে?
সাকিনার বুকের ভেতরটা আবার নতুন করে চিনচিনিয়ে উঠল। অবশ্য বিয়ের প্রস্তাবটা যখন এসেছিল, তখন ভালোই লেগেছিল। বাবা-মা, ভাইবোন সবাই খুশীতে ডগোমগো, সাকিনার এমন ভালো একটা সম্বন্ধ এসেছে। ছেলে ডাক্তার, আমেরিকাতে থাকে। একেবারে অজানাও নয়, ছেলের মা সাকিনার খালার বান্ধবী। খালা ছেলেকে ছোটবেলা থেকে দেখেছেন, ছেলের স্বভাবচরিত্র খুব ভালো, পড়াশোনাতে ভাল, দেখতে শুনতেও ভাল। ছেলের মায়ের চিন্তা ছিল—কি করে ছেলের জন্য একটি লক্ষ্মী মেয়ে খুঁজে পাবেন। খালা তার জানামতে সবচেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে সাকিনাকেই তুলে দিলেন বান্ধবীর ঘরে। সাকিনাও খুব খুশী হয়েছিল। বাসররাতে রকিবকে তার মনে হয়েছিল যেন রাজপুত্র। একমাসের ছুটি শেষে রকিব মিশিগান ফিরে গেলে বিরহব্যথায় বেশ কষ্টও পেয়েছিল সাকিনা। কিন্তু যখন তার যাবার সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল, তখন হঠাৎ একদিন তার বুক কেঁপে উঠল। এ কোথায় যাচ্ছে সে? বাপ-মা ভাই-বোন আবাল্যের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে কোথায় চলেছে সে? সে কি রকিবকে চেনে? কেমন হবে তার দাম্পত্য জীবন? চারপাশে বাবা-মা ভাইবোন বন্ধু-স্বজন কেউ থাকবে না, সে কি পারবে ভিন্নদেশের ভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে? তখন শুরু হল তার কান্না। বাবা বোঝান, মা বোঝান, মেজোভাই বোঝান। খানিক বুঝে, খানিক অবুঝ হয়ে, কাঁদতে কাঁদতেই প্লেনে উঠেছিল সে। এখনো মনটা ভার হয়ে আছে। তার ওপর শরীরের এই কষ্ট। তবে ঢাকায় প্লেনে ওঠার সময় মেজোভাই একটা কথা বলেছিল সেটা এখন মনে পড়ল। মেজোভাই বলেছিল, 'এখন তো কানতাছ, খুব কষ্ট পাইতাছ, এটা খুবই সত্য। তবে

রকিবরে যখন দেখবা, তখন কিন্তু এই কান্না আর কষ্ট ভুইলা যাবা—কইয়া দিলাম।' মেজোভাইয়ের কথাটা এখন ফলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে! এখন যত ডেট্রয়েটের কাছে আসছে, মনের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ অনুভব করছে। পাঁচ মাস পরে রকিবকে দেখবে সে। কেমন আছে সে? আগের মতই আছে তো? বিয়ের পরে একমাস সেই যে পাগলের মত ভালবাসা? দুরন্ত আবেগে তার দিনরাতের সর্বক্ষণ মুগ্ধ ঘোরে আচ্ছন্ন করে রাখা? সাকিনার অজান্তে তার হাত দুটো পেটের ওপর এসে স্থির হল। পাঁচমাসে কোমরের খাঁজ কিছুটা ভরে উঠেছে। রকিব সেই যে জলপরীকে দেখেছিল সুলতানপুরের পুকুরে; তাকে খুঁজে পাবে তো এই ঈষৎ ভরন্ত শরীরের মধ্যে?

পরমুহূর্তেই সাকিনার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, 'যাঃ কি আবোল তাবোল ভাবছি!'

এবং ভাবতে ভাবতেই তার মন চলে গেল ছয়মাস আগের সুলতানপুরে। কি কতোগুলো ছুটি আর ছাত্রদের দাবি দাওয়ার হরতাল থাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হচ্ছিল না। সেই সুযোগে সে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। যে কোন রকম ছুটির ফাঁক পেলেই সে সুলতানপুরে চলে যেত। ওখানে যাবার সবচেয়ে বড় আকর্ষন ছিল ওদের বাড়ির পেছনের পুকুরে সাঁতার কাটা। ছোটবেলা থেকে সাঁতারের পোকা সে। ঢাকার কোথাও সাঁতার কাটার কোন সুযোগ ছিল না। সাঁতার কাটতে না পারলে তার যেন গা ম্যাজম্যাজ করত।

সময়টা ছিল ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। অন্যেরা হি হি করলেও সাকিনা ঠিকই দুপুর বেলা তাদের পুকুরটায় সাঁতার কাটতে নেমেছিল। সাকিনার শীত বোধ নেই বললেই চলে। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে তাদের কাজের মেয়ে ছবুরণ বসে কাপড় ধুচ্ছিল, আর সাকিনা ছোট পুকুরটার এ-মাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সাঁতার কাটছিল মনের আনন্দে। প্রথম পৌষের মিঠে রোদ ভিজে গায়ে ভারি আরাম দিচ্ছিল। ছবুরণ কাপড় ধোয়া শেষ করে, ভিজে কাপড়ের ডাঁই ডান-হাত আর ডানকাঁখের মধ্যে বেশ কায়দা করে ধরে উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি বাড়ির ভিতর গ্যালাম গো বুবু। তুমি আইবা না?'

সাকিনা সাঁতার কাটতে কাটতে ঘাটের কাছে এসে বলল, 'আর এক পাড়ি দিয়া আসি। তুই যা।' ছবুরণ চলে গেল। সাকিনা ঘুরে আবার পুকুরের অপর পাড়ের দিকে চলল। ওই দিকের পাড়ে ছোট-বড় গাছ পালার ওধারে একটা রাস্তা রয়েছে। গাছ-পালা গুলো পুকুরটাকে মোটামুটি আড়াল করে রাখে। তাছাড়া ও পাশের রাস্তায় লোক-চলাচল থাকলেও এদিকে বিশেষ কেউ একটা আসে না। সুতরাং সাকিনা বেশ

নিশ্চিন্তে সাঁতার কাটে।
কিন্তু আজ হঠাৎ খেয়াল করল, পুকুর পাড়ে কোট-প্যান্ট পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে তার দিকে হাত তুলে কি যেন বলছে। সাকিনার ভ্রূ কুঁচকে গেল। কে রে বেতমিজ লোকটা? নিশ্চয় বাইরের কেউ হবে। গ্রামের কোন লোক মেয়েদের ব্যবহারের পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়ায় না। লোকটা সাকিনার দিকে আঙুল নেড়ে নেড়ে কি যেন বলেই যাচ্ছে। সাকিনা সাঁতার কাটতে কাটতে ওই পাড়ের কাছাকাছি গেল, তখন শুনতে পেল কথাগুলো। লোকটা জিজ্ঞেস করছে, মোসলেম আলী সাহেবের বাড়িটা কোন দিকে?
মোসলেম আলী সাকিনার বাবার নাম। সে চেঁচিয়ে বলল, 'পশ্চিম দিকের রাস্তা ধইরা চইলা যান। এই দিকে আইছেন ক্যান? এইডা মেয়েদের পুকুর। গেরামের আর কাউরে জিজ্ঞাস করতে পারেন নাই?' বলেই উল্টে গিয়ে ডুব দিল। ডুব-সাঁতারে অনেক দূর চলে গিয়ে তারপর ভুস করে মাথা তুলে ঘাটের দিকে যেতে লাগল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লোকটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মতলব ভালো নয়। বাড়ি চেনার ছুতো করে সে পুকুরে একলা তরুণীর সাঁতার কাটা দেখছে। নাঃ, আর থাকা গেল না। সাকিনা ঘাটে উঠে দুমদুম করে পা ফেলে বাড়ির দিকে চলে গেল। তার ভেজা গায়ে সূর্যের কিরণ পড়ে চমকাতে থাকল।
পুকুর থেকে বাড়ি ঢুকতে হয় পেছনের দরজা দিয়ে। ঢুকেই মস্তো বড়ো উঠোন, তার তিন দিকে ঘর আর টানা বারান্দা। বাইরের ঘর একেবারেই উল্টো দিকে—ভেতর থেকে কোনক্রমেই দেখা যায় না। দহলিজ-ঘর থেকে ভেতরে আসার যে দরজা, সেটি সাকিনার বাব-মার শোবার ঘরের পাশে এমন ভাবে রয়েছে, যে সেটা ভেতর-বাড়ি থেকে দেখা যায় না। সাকিনা বারান্দায় উঠে তার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। গা-মাথা মুছে শুকনো কাপড়-জামা পরে সে যখন আবার বারান্দায় এল, তখন সারা বাড়িতে কিসের যেন একটা চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছে। সাকিনার ছোট ভাই বোন দুটো—আমিনা আর সালাম উত্তেজিত ভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। মেজভাইকে দেখা গেল রান্নাঘরের দরজায় মাকে যেন কি বলল। আর অমনি মা শশব্যস্তে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত হেঁটে গেলেন নিজের ঘরের পানে। মার পরনে ছিল তেল হলুদ মাখা দলামোচড়া একটা শাড়ি। পাঁচ মিনিট পরে বেরোলেন ধোপদস্ত আরেকটা শাড়ি পরে। এরমধ্যে চুলেও চিরুনী বুলিয়ে নিয়েছেন। মেজভাই মার সঙ্গে কথা বলেই দহলিজ ঘরের দিকে রওনা দিয়েছিল। এখন আবার ফিরে এল দুই জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে।

একজন তার বড় খালা, অন্য জনকে সাকিনা চেনে না। সাকিনা অবাক হয়ে বলে উঠল, 'খালা, আপনি ? হঠাৎ কোন খবর না দিয়ে ?' ততক্ষণে ছবুরণ আর কাদের দুজনে দুটো চেয়ার বাবার ঘর থেকে টেনে ভেতরের বারান্দায় বসিয়েছে। সাকিনার খালা বললেন, 'এই যে সাকী, এ দিকে আয়। আমার সই, সালাম কর।' বলে চোখের ইঙ্গিতে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করবার কথা বুঝিয়ে দিলেন। সাকিনা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল। কি যেন একটা মধুর ষড়যন্ত্রের আভাষ পেল। সে মুখ নিচু করে এগিয়ে এসে ভদ্রমহিলার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। ভদ্রমহিলা 'থাক্ থাক্ মা, বেঁচে থাকো,' বলে তার থুতনিতে আঙুল দিয়ে মুখটা তুলে ধরলেন। সাকিনা লজ্জা পেয়ে খুব আস্তে থুতনিটা সরিয়ে নিল ওঁর আঙুলের ছোঁয়া থেকে। তারপর মাথা নিচু করে ধীর পায়ে নিজের ঘরে চলে গেল। খানিক পরে আমিনা আর সালাম নাচতে নাচতে এসে ঘরে ঢুকল। আমিনা উত্তেজিত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'ও বুবু। তর বিয়ার কথা কইতে অরা আইছে।'

'যাঃ।' সাকিনা এক ধাক্কা দিল বোনকে। আমিনা জোর দিয়ে বলল, 'হ' জিজ্ঞাস কর সালামরে।'

সালামও চোখ নাচিয়ে বলল, 'হ বুবু একদম সইত্য কথা। খালার লগে যেজন আইছেন, তেনার পোলাও দহলিজ ঘরে বইস্যা আছেন। হেই পোলার লগে আবার আরেকজন দাড়ি অলা লোক, সেইডা যে কেডা বোঝবার পারলাম না। সেই দাড়িঅলা, বা'জানের লগে কথা কইতাছে। তাতেই বোঝলাম।'

সাকিনার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কারা বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এল, কেইবা পাত্র, খালার সঙ্গেই বা তাদের কি সম্পর্ক ? ঐ ভদ্রমহিলা কি ছেলের মা ? মহিলা কিন্তু ভারি সুন্দরী। ছেলেও তাহলে সুন্দর হবে নিশ্চয়। হঠাৎ নিজের মনেই ভীষণ লজ্জা পেল সাকিনা। এসব কি ভাবছে সে ? সে কি তাহলে বিয়ের জন্য মনে মনে উন্মুখ ? আগে বুঝতে পারে নি ?

এমন সময় খালা এসে ঘরে ঢুকলেন। খাটে সাকিনার পাশে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সাকী, তর জইন্য একটা খুব ভাল সম্বন্ধ আনছি। ঐ যে মহিলা দ্যাখলি, উনি আমার সই, অর পোলা ডাক্তার, আমেরিকায় থাকে। ছুটিতে বাড়িতে আইছে। সই পোলারে বিয়া করাইতে চায় একটা লক্ষ্মীমাইয়ার লগে। তাই আমি অগোরে লয়া আইছি তগোর বাড়িতে।'

'অগোরে মানে ?'

'মানে পোলা-ও আইছে। আর পোলার এক মামা। তরে দেইখা

তাগোর খুব পছন্দ হইছে। এখন তর মতটা ক'।'
সাকিনার মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল। অস্ফুটে বলল, 'আপনেরা যা ভাল মনে করেন।' তারপর হঠাৎ কি মনে হতে মাথা তুলে বলল, 'খালা। অগোর পছন্দ হইছে বললেন ক্যান? শুধু তো আপনের সই দ্যাখছেন।'
খালা মুখ টিপে হাসলেন, 'নারে, পোলা-ও এর মইদ্যে তরে দেইখা ফালাইছে। তুই যখন পুকুরে সাঁতার কাটতেছিলি, তখন।'
সাকিনার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তাহলে পুকুর পাড়ের সেই কোট প্যান্ট পরা লোকটা! মাগো, কি অসভ্যতা! সে বলে উঠল, 'এ মা ছিঃ! আপনেরা তখন কই ছিলেন?'
দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসতে হাসতে খালা বললেন, 'আমরা জিপে বইসা ছিলাম। অরে শিখায়া দিলাম মোসলেম আলীর বাড়িটা কোন দিকে জিজ্ঞাস করতে।'
সাকিনার মুখ শরমে রাঙা হয়ে উঠল, 'খুব খারাপ, খালা খুব খারাপ। আপনে কি কইরা জানলেন যে ঐ সময় আমি সাঁতার কাটতে-ছিলাম?'
'একটু চান্স নিলাম আর কি! জিপ ঘুরায়া ওই রাস্তা দিয়া চালাইতে কইলাম। পুকুরটা পার হওনের সময় তাকায়া দেখলাম—দেখন যায় তো। দেখলাম তুই সাঁতার কাটতেছিস।'
সাকিনা কোপ দেখাতে গিয়ে হেসে ফেলল।

॥ দুই ॥

জানালা দিয়ে তাকালে মাঠ, রাস্তা, মানুষ, গাড়ি, গাছ, আকাশ—সব একসঙ্গে দেখা যায় না। বেইসমেন্ট ফ্ল্যাটের জানালার ওপারে খণ্ডচিত্র দেখা যায়—চলমান মানুষের পা কিংবা ধাবমান গাড়ীর চাকা। জানালার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলে আকাশের একটা টুকরো চোখে ধরা পড়ে।
বাইরে পরিবেশটা কি চমৎকার! ঘন সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন, হাঁটবার জন্য সরু ফুটপাথ, মাঝে মাঝে গাছ, তারপর চওড়া রাস্তা, রাস্তার ওপাশে লম্বা লম্বা গাছ। বেশ একটা জঙ্গল জঙ্গল ভাব। কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে হলে সাকিনাকে ফ্ল্যাটের বাইরে আসতে হবে। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে যে বাইরে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে নেবে, তার উপায় নেই। খণ্ডচিত্রে মন ভরে না। মাঝে মাঝে কেমন একটা দমবন্ধকরা ভাব হয়।

প্লেন থেকে নেমে প্রথমে উঠেছিল চাচাশ্বশুরের বাসায়। ডেট্রয়েট থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ মাইল দূরে ফার্মিংটন হিলস শহরে তাঁর বিরাট বাড়ি। চাচাশ্বশুরও ডাক্তার। বিশ বছর ধরে এদেশে আছেন, এদেশেরই নাগরিক এখন।

এয়ারপোর্টে রকিবের সঙ্গে তার চাচাতো ভাই বোনেরা গিয়েছিল। চাচা চাচী বাড়িতে ছিলেন নতুন বউকে বরণ করার জন্য। চাচী রীতিমত দেশী কায়দায় কুলোয় পান-সুপারী, প্রদীপ ইত্যাদি সাজিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সাকিনার মুখে চিনি দিয়ে তাকে ঘরে তোলেন। চাচাতো ভাইবোনেরা একটা ঘরকে ঠিক বাসর ঘরের মত সাজিয়েছিল। পাঁচমাস আগের ঢাকার বাসররাতের মতই মনে হয়েছিল সাকিনার। রকিবের তেমনি উদ্দাম ভালবাসা, তেমনি দুরন্ত আবেগে সাকিনাকে আচ্ছন্ন করে দেওয়া!

ওরা সাতদিন ছিল চাচার বাড়িতে। তারপর রকিবের এই বেইসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টে এসে উঠেছে!

চাচার বাড়ী থেকে শুক্রবার রাতের খানা খেয়ে ওরা নিজেদের ফ্ল্যাটে আসে। ঘরে ঢুকে সাকিনা মুগ্ধ হয়ে যায়। এত সুন্দর করে সাজানো বাসাটা! ছোট্ট পাখির নীড়ের মত। দুটো ছোট শোবার ঘর, বসার খাবার ঘর একত্রে আর পিচ্চি রান্নাঘর, পিচ্চি বাথরুম। পিচ্চি—কিন্তু রান্নাঘরে চারটে গ্যাসের চুলো, দেশের স্টীল আলমারীর মত বিরাট ফ্রিজ। বাথরুমে বেসিন, কমোডের পাশে বাথটাবটাও রয়েছে। আসবাবপত্র সুন্দর সুরুচিপূর্ণ। পুরো ফ্ল্যাটটা উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছিল। সাকিনার মন সুখে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

রকিব ডাক্তারী পাশ করে একটা হাসপাতালে রেসিডেন্সি করছে। ঢাকায় যেটাকে ইন্টার্নীশীপ বলে। সাধারণতঃ শনি-রবি দুটো দিন ছুটি সে কখনই ভোগ করতে পারে না, কিন্তু যেহেতু সাকিনা এসেছে, এদেশে নতুন, বাসাতে এই প্রথম একা; সে সহ-রেসিডেন্ট বন্ধুদের ধরে কোনমতে এই উইকয়েণ্ডটা খালি করেছে। সাকিনাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে হেঁটে কাছের দোকানপাটে গিয়ে মাছ, মাংস, সব্জি, রুটি, বিস্কুট, কেক পেস্ট্রি—যা যা লাগে সব কিনেছে। সাকিনাকে শিখিয়েছে কেমন করে এসব দোকানে জিনিসপত্র কিনতে হয়, কেমন করে কোথায় দাম দিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। বাসায় ফিরে, কি করে চুলো ধরাতে হয়, কিভাবে আভ্‌ন্ ব্যবহার করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছে। উইকয়েণ্ডের দুটো দিন সে সাকিনাকে রান্নায় সাহায্য করেছে, খাওয়া দাওয়ার পর থালাবাসন ধুয়ে দিয়েছে। হাসি, কৌতুক

কল-কুজনের ভেতর দুটো দিন হাওয়ায় ভর দিয়ে উড়ে গেছে। আজ সোমবার সকালে রকিব সাতটাতেই হাসপাতালে চলে গেছে। এই পাখির নীড়ে সাকিনা এখন একা। নীড়টাকে তার খুব বড়ো, খুব খালি লাগছে। আর ঐ যে ছাদের ঠিক নীচ থেকে জানালাটা ঝুলে আছে, ঘরের মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে, জানালার নীচের কার্নিসটাই তার গলার কাছাকাছি। তার মানে ঘরের এতখানি মাটির নীচে! একেক সময় সাকিনার কেমন যেন বুক-চাপা দম আটকানো ভাব হচ্ছে। আজ রকিব ফিরলে তাকে জিজ্ঞেস করবে, এরকম মাটির নীচের বাসা সে নিয়েছে কেন? রকিব বলেছে, মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ো, ফুটপাথ ধ'রে হেঁটো, তবে দেখো চাবি সাথে নিতে ভুলো না। এদেশের দরজাগুলো শুধু খোলবার সময় চাবি লাগে, বন্ধ করার বেলা টেনে দিলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ঘরে চাবি রেখে বাইরে বেরিয়েছ কি মরেছ। তখন দৌড়াও অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের অফিসে, কেয়ার-টেকারের কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি আন—এতসব ঝামেলা। এখানে আসার পর থেকে রকিব তাকে খালি শেখাচ্ছে। আসার পরেই বা কেন? আসার আগে থেকেও তো। বিয়ের কথা পাকা হয়ে সাত দিনের মধ্যে বিয়ে হল। তার পর পরই রকিবের কথামত সে ধানমণ্ডির মিসেস টমসনের ইংরেজী কথা বলার ক্লাসে ভর্তি হল। তারটা ছিল ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। দৈনিক চার ঘন্টা করে ক্লাস—সপ্তাহে ছয়দিন। পাঁচ মাস ধ'রে সমানে চলেছে। এখন বেশ ফড়ফড় করে বলতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে—মিসেস টমসন ছিলেন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তাঁর কাছে ইংরেজী শিখে এখানে আসার পরে এদেশী লোকের উচ্চারণ সে বুঝতে পারে না। ফলে রকিবের ধারণা হয়েছে সে ঢাকায় তার ইংরেজী শেখার ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী হয়নি। তাই রকিব এখন তাকে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরেজীও শেখাচ্ছে উঠতে বসতে!

ঘড়ির দিকে তাকাল সাকিনা। দুপুর বারোটা। রকিব যখন যায়, তখনো সে বিছানায়। রকিবই তাকে অত সকালে উঠতে বারণ করেছে। নিজেই নিজের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে খেয়ে আধ-ঘুমন্ত সাকিনার ঠোঁটে চুমু দিয়ে 'বাই ডার্লিং, সি ইউ' বলে চলে গেছে। একেবারে পাকা সাহেবী ধরন-ধারন। সাকিনার দুই ঠোঁট ফাঁক করে একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। এমন পাগল! কাল রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত তাকে জাগিয়ে রেখেছিল। ঘুমোতে যাবার আগে ঘড়িতে ছটায় অ্যালার্ম দিয়ে বলেছিল, 'শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলে আবার ঘুমিয়ো। অত সকালে তোমার ওঠার কোন দরকার নেই। আমার অভ্যেস আছে রাত ৪টায় শুয়ে

৬টায় ওঠার। তোমার এখন বেশি ঘুম আর রেস্টের দরকার। আহা, কি বিবেচনা! রাত দুটো পর্যন্ত জাগাবার বেলা মনে থাকে না? তার চিরকাল ভোরে ওঠা অভ্যেস। তাই সেও বেশি বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে পারেনি। আটটাতেই উঠে পড়েছে। এই প্রথম একা বাসাতে একা একা নাশতা করা। রোকেয়া হলেও প্রায় প্রায়ই ঘরে নিজে নাশতা বানিয়ে খেত কিন্তু সেখানে ঘরে, বারান্দায় সর্বত্র আরো মেয়ে গিজগিজ করত। সেজন্য একা লাগত না। আজকেও খুব একটা খারাপ লাগল না। কেমন নতুন একটা অনুভূতি। সুপুরুষ প্রাণবন্ত স্বামীর প্রেমে, আদরে, আহলাদে সারা শরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—তার নিবিড় উষ্ণ আলিঙ্গনের প্রলেপ এখনো যেন শরীরের পরতে পরতে লেপ্টে আছে। কেমন এক মধুর আলস্যে শরীর এলিয়ে পড়তে চাইছে, ঘুমঘুম লাগছে। রকিবের দুই হাতের সবল বেস্টনীর স্মৃতি সারা শরীরে অনুভব করতে করতে সাকিনা আবার বিছানায় গিয়ে উপুড় হল। কত কাজ বাকী পড়ে রয়েছে। এখানে এসে তক কেবল আব্বা মাকে চিঠি দিয়েছে—সংক্ষিপ্ত। চাচার বাসায় থাকার সময়। তার নতুন বাসার নতুন সংসারের সব খুঁটিনাটিসহ বড়ো চিঠি লিখতে হবে মাকে, বোনকে, মেজো ভাইকে।

ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ কি একটা শব্দে জেগে গিয়ে দেখে রকিব তার মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। সে চমকে উঠে বসতে যেতেই একেবারে রকিবের বুকের ভেতর চলে গেল, রকিব তার ঠোঁটে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে অস্ফুটে বলতে লাগল, 'ঘুমোলে তোমাকে যে কি সুন্দর লাগে।'

তার উষ্ণ ঠোঁটের ভেতর থেকে নিজের মুখটা উদ্ধার করে সাকিনা বলল, 'কখন এসেছ টেরই পাইনি। কই, বেল তো বাজে নি?'

রকিব হেসে বলল, 'বেল বাজবে কেন? আমি তো চাবি দিয়ে দরজা খুলেছি। এখানে বেল বাজাবে বাইরের অতিথি, বন্ধু বান্ধব।'

'কেন আমি বাসার ভেতর থাকলে তোমার বেল বাজাতে বাধা কোথায়? আমি খুলে দেব।'

'নাঃ, এখানে সে অভ্যেস সেই। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে—সবার কাছে একটা করে চাবি থাকে, সবাই নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে।'

'তার মানে দরজায় ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো থাকে না। যে কেউ বাইরে থেকে দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে পারে?' সাকিনা হঠাৎ শিউরে উঠল, মাগো! চোর-চোট্টারা তো অনায়াসে শিক বা কিছু দিয়ে দরজা খুলে ঢকতে পারে?'

রকিব সাকিনার নাকটা ধরে নাড়িয়ে বলল, 'ভীতুর ডিম। এদেশে ওরকম ছ্যাচড়া চোর নেই। চোর যা, তা সব বড় বড় জুয়েলথিফ বা ব্যাংক রবার। সেসব কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। সাধারণ লোকদের বাড়ি-ঘর খোলা রাখলেও কেউ ঢোকে না, কিছু চুরি করে না।'

'তা কি করে হয়? সেদিন যে চাচী বললেন ডেট্রয়েটে তাঁর চেনা এক বাঙালীর বাসার তালা ভেঙ্গে কালোরা গয়না চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'ওরকম দু'একটা জায়গায় হয়, সেখানে অল্প শিক্ষিত গরীব কালোরা বাস করে। তাছাড়া ঐ বাঙালী মহিলা নিশ্চয় তার বাইশ ক্যারেট নিরেট সোনার বা চুনি পান্না বসানো জড়োয়া গয়না পরে খুব দেখিয়ে বেড়িয়েছে, জানতো এদেশের কোন গয়না আঠারো ক্যারেটের বেশি হয় না। বেশির ভাগই চৌদ্দ ক্যারেট। আর আসল মণিমুক্তো ক'জনে পরতে পারে? তাই ওসবের ওপর চোরদের খুব লোভ।'

সাকিনা ভয় খাওয়া গলায় বলে উঠল, 'আমার যে এত গয়না—'

রকিব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'শোন, এই রচেস্টার শহর খুব নিরাপদ, এটা পুরনো অভিজাত এলাকা, এখানে গরীব, কালো, গুণ্ডা বদমাশ নেই। তোমার কোন ভয় নেই। তাছাড়া গয়না তো আমি শীগগীরই ব্যাংকের লকারে সব রেখে দেব।'

সাকিনার হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল, 'আচ্ছা, কটা বাজে? তোমার কি এখন ফেরার কথা?'

রকিব দুষ্টু হাসি হাসতে হাসতে সাকিনাকে দুই বাহুর মধ্যে বন্দী করে ফেলল, 'মোটেই না। আমার ফেরার কথা সেই ছটায়, এখন বাজে দুটো। এক বন্ধুর ডিউটি শেষ, তাকে হাতে পায়ে ধরে দু'ঘন্টা আমার জায়গায় রেখে চলে এসেছি।'

সাকিনা খাট থেকে নামতে গেল, 'চল খাবে—'

'কি খাবো এখন? লাঞ্চ তো করেছি। তুমি খাওনি?'

'না, খিদে পায়নি, দেরী করে নাশতা খেয়েছি। তা তুমি যখন বাড়িই আসবে, লাঞ্চ খেতে গেলে কেন?'

'বারে লাঞ্চের সময় লাঞ্চ খাব না? এখানে সারাদেশে সবাই বারোটা থেকে একটার মধ্যে লাঞ্চ করে। শনিবার অনেক অফিস দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে। তারাও বারোটার সময় অফিসে লাঞ্চ সেরে দুটোর সময় বাড়ি ফেরে।'

সাকিনা মৃদু হেসে বলল, 'আজব দেশ। যাকগে, আমি তো এখনো এদেশের নিয়মে অভ্যস্ত হইনি, আমি দুটো আড়াইটেতেই খাব।'

রকিব তর্জনী উঁচিয়ে বলল, 'না, কখনই না। এরকম অনিয়ম তুমি করতে পারবে না। তুমিও বারোটা একটাতেই লাঞ্চ সারবে। আস্তে

আস্তে এদেশের নিয়মে অভ্যস্ত হওয়াই ভাল। সেটা স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল বটে।'

॥ তিন ॥

সাকিনা যেদিন ঢাকায় প্লেনে চড়ে, সেদিন ছিল চৌঠা রমজান। দেখতে দেখতে সাতাশ রোজা পার হয়ে গেল। এখানে এই জুন মাসে সূর্য ডোবে রাত সোয়া ন'টা সাড়ে নটায়। এখানে লোকেরা রোজা রাখে কি করে?

'খুব কম লোকে রাখে। আমি তো আমার চেনাজানা কাউকে রাখতে দেখিনি। কেউ কেউ উইকয়েণ্ডে রাখে।'

'এখানে ঈদের নামাজ হয়?'

'নিশ্চয় হয়। আগে শুধু ডেট্রয়েটে মসজিদ ছিল, আমাদের ঈদের নামাজ পড়তে ওই অতদূরে যেতে হত। এখন কাছেই আরেকটা মসজিদ হয়েছে—ফার্মিংটন শহরে। এটা হয়ে আমাদের খুবই সুবিধে হয়েছে। ফার্মিংটন এলাকাটাও ভাল, খোলামেলা, নতুন গড়ে উঠছে, খুব দামী এলাকা।'

চাচার বাড়ীতে ওদের দুজনের ঈদের দাওয়াত—আজই রাত্রে যাবে। এই সপ্তাহ পরেই চাচা মিশিগানের পাট উঠিয়ে শিকাগো চলে যাচ্ছেন—ওখানে একটা হাসপাতালে ভাল অফার পেয়েছেন, আবার প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতে পারবেন। তাই আজ থেকে সাত দিন রকিব সাকিনা চাচার বাড়িতে কাটাবে।

সাকিনা একটা ছোট স্যুটকেসে কিছু কাপড়-জামা ভরছিল সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। রকিব এগিয়ে এল, 'দেখি, কি কি শাড়ি নিলে? নামাজে যাবে কোন শাড়িটা পরে?'

সাকিনা অবাক হয়ে বলল, 'নামাজে মানে?'

'মানে ঈদের জামাতে, মসজিদে। জান না, এখানে মেয়েরাও সবাই ঈদের নামাজ পড়তে মসজিদে যায়।' রকিব সাকিনার শাড়ি হাঁটকাতে হাঁটকাতে একটা সোনালী জরীর কাজ করা ফিরোজা রঙের কাতান বেনারসী তুলে বলল, 'এইটা পরবে ঈদের দিন।'

'মসজিদে নামাজ পড়তে যাব কাতান পরে?'

'হ্যাঁগো, তাই সবাই যায় এদেশে। খ্রীস্টানরা যেমন রোববারে গির্জায় যায় তাদের 'বেস্ট সানডে ড্রেসটা' পরে, এখানে মুসলমান মেয়েরাও তাদের বেস্ট শাড়ি গয়না পড়ে মসজিদে যায়।'

'গয়নাও?' সাকিনা হেসে ফেলল।

'হ্যাঁ গয়নাও। ওটা না হলে সাজটা পুরো হবে না তো!'
'আমি না হয় বিয়ের সাজে নামাজ পড়তে যাব, আমার সঙ্গে, ম্যাচ করে শেরোয়ানী পাগড়ী তো তোমার নেই? মা যে ঈদের নাম করে তোমাকে পায়জামা পাঞ্জাবি আর টুপি পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে, তা যে নেহাৎ সাদামাটা।'
'ছেলেরা সাদামাটাই পরে। তোমার মা যে রকম কারুকার্য করা সিল্কের পাঞ্জাবি এবার দিয়েছেন, তা মোটেও সাদামাটা নয়। আর পায়জামা তো পরব না—খুব দামী একটা ম্যাচকরা প্যান্ট পরব। ইনফ্যাক্ট, তুমি যখন পাঞ্জাবিটা আমাকে দেখালে, তার পরেই একটা ম্যাচিং কালারের প্যান্ট আমি কিনে ফেলেছি। এই দেখ।'
'তুমি তো কম নও। তলে তলে এত প্ল্যান মাফিক কাজ করা হয়ে গেছে?'
'না হবার কি আছে? জীবনটা শান-শওকতের সঙ্গে ভোগ করতে হলে প্ল্যান প্রোগ্রাম তো করতেই হবে।'
দুজনে স্যুটকেসটার সামনে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসেছিল, রকিব হঠাৎ একটু সামনে এগিয়ে সাকিনার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল। সাকিনা তাল সামলাতে না পেরে পেছনে হেলে, 'যা ঃ, কি হচ্ছে' বলতে না বলতে রকিব, তাকে দু'হাতে জড়িয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল, তার ঠোঁটে, গালে, গলায় চুমু দেবার ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগল, 'তোমাকে ভোগ করব বলেই তো এক বছর ধ'রে কতো প্ল্যান করা হয়েছিল, জানো না? আমার মা জননী তোমাকে আমার জীবনের শোভা বানাবার জন্য বিরাট প্ল্যান-প্রোগ্রামের জাল পেতেছিলেন। তার জন্য আমাকে সুলতানপুরে পাঠানো হয়েছিল। অত কষ্ট করে এবড়ো-থেবড়ো ধুলোর রাস্তায় জিপ চালিয়ে সেই গণ্ডগ্রামে গিয়েছিলাম বলেই না এমন জলপরীকে দেখতে পেলাম। আজকের এই ভোগের পরিপাটি আয়োজনের জন্য আমাকে দশ হাজার মাইল দূরে বাংলাদেশে ট্রিপ দিতে হয়েছে।'
সাকিনা প্রথমটায় খিলখিল হাসির সঙ্গে এই প্রেমের খেলায় যোগ দিয়েছিল, এখন হঠাৎ রকিবকে ঠেলে উঠে বসে অভিমানী গলাতে বলল, 'কি তখন থেকে ভোগ ভোগ করছ! আমি কি শুধু ভোগের বস্তু?'
রকিবও উঠে বসে দুই হাত উল্টে বলল, 'এইরে! আরম্ভ হল তোমার বাংলাদেশী ন্যাকামো। জীবনটা ভোগ ছাড়া আর কি? পবিত্র বিবাহ বন্ধন, সুখী ও সার্থক দাম্পত্য-জীবন, সন্তান-পালন—এসবই তোমার হল গিয়ে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির প্যাঁচাল। বলতে পার, দুটো পূর্ণবয়স্ক সুস্থ নরনারীর বিবাহিত জীবনের প্রধান আকর্ষণ কি? যৌন মিলন। ওটা ঠিকমত না হলে বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা বল, সার্থকতা বল,

সন্তান পালনের মহান দায়িত্ব বল, সব পানসে হয়ে যেতে বাধ্য।'
সাকিনা হঠাৎ ঘুরে বসল। তার মুখ থমথমে হয়ে উঠেছে। ছিছি, রকিব এসব কি বলছে? তার দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।
রকিব থমকে গেল। 'ঘুরে বসলে যে? খারাপ কি বললাম?'
'খুব খারাপ কথা বলেছ। খুব খারাপ—'
সাকিনাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রকিব গলায় জোর এনে বলল, 'এসব তোমার সংকীর্ণ ধারণা। এগুলো এখন থেকে বদলাবার চেষ্টা কর। এদেশে আমরা তিন-চার বন্ধু একত্র হলে হরদম এরকম তর্ক করি; কেউ কিছু মনে করে না। উল্টোপাল্টা কথা বললে কেউ অত সহজে রি-অ্যাক্ট করে না। তোমাকেও এগুলো একটু একটু করে বুঝতে হবে, শিখতে হবে। রোজ ভাল করে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন পোড়ো, দেখবে কতোরকমের স্বাধীন চিন্তা যে লোকে করে। যে যা বিশ্বাস করে তা জোর গলায় বলতে ভয় পায় না। নিজের বিশ্বাসমত কাজেও পেছপা হয় না, তা লোকে যতই নিন্দে করুক।'
সাকিনা তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'অমি আসার পর থেকে তুমি খালি আমাকে শেখাচ্ছ। এটা করো, ওটা করো। এরকম ভেবো না, ওরকম পোরো না, এইরকম করে চলো, ওইরকম করে বলো। কেন আমার নিজের কিছু নেই নাকি? আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে, পছন্দ অপছন্দ'—কথা শেষ করতে পারল না, কান্নায় গলা ভেঙ্গে গেল।
রকিব হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর খুব আস্তে সাকিনার কাঁধ ধরে তার দিকে ফিরিয়ে কোমল গলায় বলল, 'আয়াম সরি। আমি অত ভেবে বলিনি। যাকগে বাদ দাও এখন এসব কথা। এসো, স্যুটকেস গুছিয়ে নিই। বেরুতে দেরী হয়ে যাবে।'

॥ চার ॥

ঈদের দিন সকালে সাকিনার সঙ্গে রকিবের আবার একটু মতান্তর হয়ে গেল। দশটায় জামাত। বাসা থেকে সবাই বেরোবে নয়টায়। কাছেই মসজিদ কিন্তু তাড়াতাড়ি না গেলে ভেতরে জায়গা পাওয়া যাবে না। সবাই খুব সকালে উঠেছে। সাকিনা সাতটাতেই খোঁপা বাঁধতে বসেছে। বেশ কারুকার্যময় খোঁপা, ঢাকায় থাকাকালীন বেশ কষ্ট করে শিখেছে। রকিব বাথরুম থেকে এসেই বলে উঠল। 'এই খোঁপা বেঁধো না খোঁপা বেঁধো না—চুলটা ছেড়ে রাখ, খুব চমৎকার লাগবে।'
'দুর, নামাজে চুল খুলে যাওয়া যায় নাকি? তাছাড়া চুল ছেড়ে বাইরে কোথাও যাওয়াটা তো অভব্যতা।'

'কে বলেছে তোমায়? এদেশে সবাই বেশিরভাগ সময় চুল ছেড়েই রাখে। তাছাড়া তোমার যা লম্বা চুল, ছেড়ে রাখলে যা মানাবে না! সবার মুন্ডু ঘুরে যাবে।'

সাকিনা চোখ পাকিয়ে বলল, 'আবার এদেশের কথা? তাছাড়া মাথায় কাপড় দিয়ে নামাজ পড়ার সময় খোলাচুল সামলাবো কি করে?' বলে সাকিনা আবার খোঁপা বাঁধার কাজে দুই হাত মাথার পেছনে তুলল।

রকিব গলায় জেদ এনে বলল 'না, তুমি খোঁপা বাঁধতে পারবে না। চুল ছেড়েই যাবে।'

সাকিনার ভ্রূ কুঁচকে গেল, 'কি আযাইরা জেদ করছ? কোথায় কিভাবে ড্রেস করে যেতে হবে, তার একটা মাপকাঠি আছে না? পার্টির দিনে না হয় চুল ছেড়ে রাখব।'

ঈদটা বৃহস্পতিবারে পড়েছে উইক-ডে-তে। এদেশে ঈদের ছুটি নেই। যারা নামাজ পড়তে চায় তারা সবাই নামাজের জন্য ছুটি নিয়েছে। কিন্তু ঈদের ভোজটা হবে উইকয়েণ্ডে, শনিবার রাতে।

রকিব হঠাৎ রেগে গেল, 'তুমি দেখছি সব ব্যাপারেই আমার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছ। আমি ভালো মনে যা-ই বলছি, তুমি তার উল্টোটা করছ। আমি বলছি চুল ছেড়ে গেলে মোটেও খারাপ দেখাবে না, তবু তুমি জেদ করে এঁড়ে তর্ক তুলছ।'

সাকিনাও রেগে বলে উঠল, 'আমার ভীষণ অপছন্দ নামাজে চুল ছেড়ে যাওয়া। আমি চুল বেঁধেই যাব।'

'না, তুমি চুল ছেড়ে যাবে।'

'তাহলে আমি যাবই না।'

রকিবের দুই চোখ ধ্বক ধ্বক করে উঠল। 'তুমি অবশ্যই যাবে এবং চুল ছেড়েই যাবে।'

রকিবের দিকে তাকিয়ে সাকিনা হঠাৎ যেন জমে গেল। বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উঠে বিছানায় আছড়ে উপুড় হয়ে পড়ল, হু হু করে কাঁদতে লাগল।

'ভাবী, আর ইউ ডান?' বলতে বলতে রকিবের চাচাত বোন সীমা ঘরের কাছে এসে ব্যাপার দেখে হঠাৎ মাম্মি, মাম্মি বলে ছুটে চলে গেল। আর এক মিনিটের মধ্যেই চাচী, চাচা, সীমা, সীমার ভাই রবিন—সবাই এসে হাজির। চাচা এসেই রকিবকে এক ধমক লাগালেন, চাচী সীমা সাকিনার দুপাশে বিছানায় বসে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। চাচা রকিবকে কাঁধের কাছে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে চাপা গলায় বকে উঠলেন, 'কিরে, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে শেষ রক্ষা হয়েছে, তুই সেটা নষ্ট করে দিতে চাস? খবরদার বউমার ওপর এত সরদারী

করবি না। ভাল ঘরের নম্র স্বভাবের মেয়ে, কোথায় তাকে নিয়ে শান্তিতে সংসার করবি, তা না—'

রকিব বলতে গেল, 'চাচা আমি তো বেশী কিছু বলিনি—'

'কি বলেছিস আর কি বলিসনি তা আমার জানার দরকার নেই। তোর জন্য অনেক ঝামেলা সয়েছি, আর নয়। মনে রাখিস, আই ক্যান স্টিল রুইন ইয়োর ক্যারিয়ার। অত ভালো মেয়েটাকে যদি কষ্ট দিস, তোকে তাহলে ছাড়বো না। এখন যা মাপ চেয়ে, মান ভাঙ্গিয়ে তৈরী করে নে। আজ আর ভেতরে জায়গা পাব বলে মনে হয় না।'

রকিবকে আর কষ্ট করতে হল না। দেখা গেল ইতিমধ্যেই সাকিনা বিছানা থেকে উঠে আবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসেছে আর স্বয়ং চাচী তার চুল বেনী করে দিচ্ছেন। 'এখন আর সময় নেই বেশী, শুধু বেনী করেই চলো বউমা। পার্টি'র দিন তোমার পছন্দ মত খোঁপা বেঁধো।'

সবাই খুব তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে বেরিয়েও দেখা গেল মসজিদের ভেতরটা ও বাইরের বারান্দা লোকজনে ভরে গেছে। বারান্দার পরেও লনে বড় বড় সাতরঞ্জি বিছানো হয়েছে। মেয়েদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা অবশ্য ভেতরেই, আলাদা একটা পাশে।

চাচী আর সাকিনার হাতে বড় বড় দুটো ডিশ ভর্তি সেমাইয়ের জর্দা। বাড়ি থেকে বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। ওঁরা গাড়ি থেকে নেমে প্রথমে লনের পেছনদিকে গেলেন। সেখানে বড় বড় টেবিলে সেমাই, জর্দা, ফিরনীর বড় বড় ডিশ একে একে জমা হচ্ছে। প্রতিটি পরিবারই কিছু না কিছু নিয়ে এসেছেন। আগে থেকে ঠিক করে দেয়া হয়েছে—কে কি নিয়ে আসবেন। নামাজ শুরু হতে এখনো কিছুটা দেরী আছে। কয়েকজন মহিলা বিরাট কাঁচের গামলায় ফ্রুট জুস ঢালছেন। অন্য দুজন পলিথিন ব্যাগ থেকে বের করছেন গাদা গাদা কাগজের প্লেট আর গ্লাস।

মসজিদে নামাজ পড়া সাকিনার জীবনে এই প্রথম। খুব ভাল লাগছিল তার। কতো যে মহিলা এসেছেন, তার চেয়েও বেশী এসেছে বাচ্চা।

একটু পরে নামাজের সময় হল। মায়েরা বাচ্চাদের হাত ধরে মসজিদের ভেতরে তাঁদের সংরক্ষিত জায়গার দিকে চলে গেলেন। পুরুষরা যাঁরা দেরী করে এসেছিলেন, তাঁরা লনে বিছানো সাতরঞ্জির ওপর দাঁড়ালেন।

নামাজের সময় আলাদা পড়লেও খাবার সময় মেয়ে পুরুষ সবাই একত্রে মিলিত হলেন খাবার টেবিল ঘিরে। কখনো রকিব, কখনো

চাচী বাঙ্গালী অনেকের সঙ্গে সাকিনার পরিচয় করিয়ে দিলেন। খুব ভালো লাগছিল সাকিনার। প্রায় দেশের বাড়ির ঈদের মতই। পরিবেশ ভিন্ন কিন্তু এত লোকজনের মেলামেশা, ছোট ছেলেমেয়েদের দৌড়োদৌড়ি, পরিচিত সেমাই ফিরনী—এসবে দেশের গন্ধ পাচ্ছিল সে। যদিও সমাগত লোকজনের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই পাকিস্তান, আরব, ইরাক, ইরান, মিশর, লেবাননের অধিবাসী—তবুও।

একটি মেয়ে খাবারের প্লেট হাতে ঘুরতে ঘুরতে এসে সাকিনার পাশে দাঁড়াল, একটু আগেই এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাকিনা নামটা মনে করতে পারল না। মেয়েটি সেটা বুঝে হেসে বলল, 'আমার নাম ইয়াসমীন, বাবা-মার সঙ্গে এদেশে আছি পনের বছর। ঐ যে আমার মা'—বলে ইয়াসমীন ডাক দিল 'মা মা শুনে যাও, এই যে ইনি রকিব ভাইয়ের বউ।'

'তাই নাকি? বাঃ ভারী সুন্দর বউতো। রকিবের কপাল বটে। অনেক ভারী গহনা আর ভারী জরীর কাজ করা ঝলমলে শাড়ি পরিহিতা ইয়াসমীনের মা এসে খুঁটিয়ে সাকিনাকে দেখতে লাগলেন। সাকিনা একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ইয়াসমীন ব্যাপারটা বুঝে 'চলুন আপনাকে ওদিকে আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

ইয়াসমীন মেয়েটিকে সাকিনার খুব ভাল লেগে গেল। লম্বা, একহারা গড়ন, ফর্সা রং, সোনালী চুল অথচ শাড়ি পরে আছে; বাংলা বলার অ্যাকসেন্টও তো খাঁটি বাঙ্গালী, মা-টিও হুবহু বাঙ্গালী রমনী—তাহলে ওর সোনালী চুল, অতিরিক্ত ফর্সা রঙ? মেয়েটি যেন অন্যের মনের কথা পড়তে পারে, হেসে বলল, 'পিগমেন্টের অভাব। ঢাকায় দেখেননি —কোন কোন ছেলেমেয়ের চুল সোনালী, গায়ের রঙ অতিরিক্ত সাদা?' সাকিনা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল, দেখেছে।

ইয়াসমীন তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গে আলাপ করাল। নিজেও নানা বিষয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে লাগল। বলল ৭১ সনে কিভাবে তার বাবা-মা তাদের চার বোনকে নিয়ে করাচী থেকে প্রথমে লণ্ডনে আসে, তারপর এখানে এসে অনেক কষ্ট করে একটা ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা গড়ে তুলেছে। এখন তারা সবাই মোটামুটি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ইয়াসমীন লেখাপড়া শেষ করে বাবার ট্র্যাভেল এজেন্সিতে যোগ দিয়েছে। 'আমাদের কোন ভাই নেই তো। আমি তাই বাবার বড় ছেলে' বলে মুক্তোর মত দাঁত বের করে হাসল।

ইয়াসমীনের হাসিটা বড় সুন্দর। এই অল্প দশ পনের মিনিটের মধ্যেই সাকিনা তাকে প্রিয়সখী বানিয়ে ফেলল মনে মনে। এখানে আসার পর

এই প্রথম সে একটি মেয়ের দেখা পেল, যে তার সমবয়সী, যে অনর্গল বাংলাতেই কথা বলল এতক্ষণ, যার সঙ্গে সেও প্রাণ খুলে বাংলায় কথা বলতে পারল। এই প্রথম উপলব্ধি করল এতদিন বাংলায় কথা বলে তার তৃপ্তি হয়নি। চাচী মুরুব্বি মানুষ, এমনিতেও কথা কম বলেন, সীমা, রবিন একেবারে শিশু বয়স থেকে এদেশে মানুষ হবার ফলে বাংলার চেয়ে ইংরেজীই বলে বেশী। রকিবের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলাটা ঠিক হয়ে ওঠেনি, তার সঙ্গে অর্থহীন কলকূজনের সঙ্গে প্রণয়লীলাতেই সময় কেটেছে বেশী, কথা যা হয়েছে তা বেশীর ভাগ হয় সংসারের কথাবার্তা, নয় রকিবের মাস্টারী।

ওরা দুজনে ভীড় থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে আলাদা দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ইয়াসমীন নিজের সম্বন্ধে এত কথা বলার পর সাকিনাও অসংকোচে তার কথা বলছিল ইয়াসমীনকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ছিল হলে থেকে। রোকেয়া হল, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন কেমন, কেমন করে তার বিয়ে হয়ে অনার্স পরীক্ষা না দিয়েই এদেশে এসেছে—এই সব। ইয়াসমীন কখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েনি, রোকেয়া হলে থাকে নি, কারণ তার বাবা পিআই এ-তে চাকরি করতেন এবং তাদের ছোটবেলাটা করাচীতেই কেটেছে। ইয়াসমীন খুব মনোযোগ দিয়ে সাকিনার ক্যাম্পাস জীবনের কথা শুনছিল। এমন সময় রকিব সেখানে এসে হাজির। 'আরে তুমি এখানে? তোমাকে সারা দুনিয়া খুঁজে এলাম!' ইয়াসমীনের দিকে তাকিয়ে একটু কাষ্ঠহাসি হাসল, 'হ্যালো ইয়াসমীন, কেমন আছ? বহুদিন দেখা নেই।'

'হ্যাঁ, এখন তো দুজনের রাস্তা আলাদা, তাই দেখা হয় না।'

'সাকী এবার বাড়ি ফিরতে হবে। চাচী যেতে বলেছেন। বাসায় অনেক কাজ পড়ে আছে। চল। আচ্ছা ইয়াসমীন, গুড বাই।'

ইয়াসমীন মিষ্টি হেসে 'বাই' বলে মেয়েদের ভীড়ের দিকে চলে গেল।

গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত রকিব কোন কথা বলল না, বিভিন্নজনের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিতে লাগল। গাড়ি চলামাত্র তার মুখভাব বদলে গেল, চিবিয়ে বলল, 'ওই মেয়েটার সঙ্গে এত ভাব কখন হল?'

সাকিনা একটু চমকে গেল, 'কি ব্যাপার? অমন করে বলছ কেন? এখানেই তো আলাপ হল!'

রকিব রূঢ়কন্ঠে বলল, 'মেয়েটা সুবিধের না। ওর সঙ্গে মিশবে না।'

সাকিনা আহত স্বরে বলল, 'আমার মেশা না মেশার সুযোগ কোথায়? যেখানে নিয়ে যাও, সেখানে ছাড়া নিজে নিজে কোথাও যাবার উপায় আছে যে মিশতে বারণ করছ? কিন্তু ব্যাপারটা কি? মেয়েটা তো ভারি চমৎকার—'

'হ্যাঁ, প্রথমে অমনি চমৎকারই লাগে। তারপর স্বরূপ বেরোয়।'

মসজিদ প্রাঙ্গণের ভালো লাগাটুকু উড়ে গিয়ে সাকিনার আবার খারাপ লাগতে শুরু করল। রকিবের হয়েছেটা কি? কদিন থেকেই ও এরকম করছে। ক্ষণে ভালো মেজাজ ক্ষণে রেগে টং। সকালে চাচী আর সীমা তাকে সান্ত্বণা দিতে এলে রকিবকে চাচা ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে রাগ রাগ গলায় কি যেন সব বকাবকি করছিলেন। সাকিনা কথা বুঝতে পারেনি, কিন্তু চাচার ক্রুদ্ধ কন্ঠস্বর তার কানে এসেছে। চাচা অত রেগে গেলেন কেন? সীমাই বা অমন ত্রস্ত হয়ে ছুটে মাকে ডাকল কেন, চাচীই অমন করে ছুটে এলেন কেন? স্বামী স্ত্রীর মন কষাকষিকে তাঁরা সবাই যেন একটু বেশী গুরুত্ব দিয়ে নিজেরা ছুটে এসেছেন। কেন? এর মধ্যে কি কোন রহস্য আছে? এখন আবার রকিবের এই রকম ব্যবহার। ইয়াসমীন মেয়েটাও কিন্তু বলেছিল, এখন দুজনের রাস্তা আলাদা বলে দেখা হয় না। এ কথার অর্থ কি? সাকিনার মাথাটা কেমন যেন ঘুরতে লাগল, বুকটা খালি মনে হচ্ছে, পেটের মধ্যে যেন মোচড় দিচ্ছে। সে সীটের পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজল। রকিব হঠাৎ চকিত হয়ে নিজেকে সামলে নিল। স্বরে মমতা আর উদ্বেগ এনে বলে উঠল, 'কি মনি? খারাপ লাগছে? কি রকম লাগছে? গাড়ি থামাবো?'

পেটের ওপর দুই হাত রেখে সাকিনা চোখ বন্ধ অবস্থাতেই মাথা নাড়ল। রকিব আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'পেটে ব্যথা করছে? হ্যাং অন সোনা, এক্ষুণি বাড়ি পৌঁছে যাব। খুব বেশী ব্যথা? এখন তো ব্যথা হবার কথা নয়। এখন তো মোটে ছয় মাস—'

সাকিনা হেসে ফেলল, চোখ খুলে রকিবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'পেটে এমনি হাত বোলাচ্ছিলাম বুদ্ধু, ব্যথা হতে যাবে কেন খামোখা? শুধু শুধু সীন করো!'

রকিবও হেসে দিল। মেঘটুকু উড়ে গেল এই হাসির ঝাপটায়।

।। পাচ ॥

সুমিতকে নিয়ে একেবারে সময় পায় না সাকিনা। কতোদিন যে চিঠি লেখা হয় না মেজো ভাইজানকে। আজ সকালে সুমিতকে খাইয়ে,

দৃঢ় সংকল্প হয়ে অন্য সব কাজ ফেলে সে চিঠি লিখতে বসেছে। পাক জোনাবেষু মেজো ভাইজান, আমার শত কোটি সালাম নিবেন—এই পর্যন্ত লিখে সে বহুক্ষণ বসে রইল। মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে তারপর লিখতে শুরু করল—এবারে আপনাকে চিঠি দিতে বেশ দেরী হল। সঙ্গত কারণেই খুব ব্যস্ত ছিলাম। টেলিগ্রামে জেনেছেন সেটা। এখন খোকাকে নিয়ে বাড়িতে এসেছি। এখানে তো মা, খালা, শাশুড়ী, বোন কেউ নেই—সব কাজ নিজেদেরই করতে হয়। চাচী শ্বাশুড়ী ছিলেন একজন এখানে তিনিও শিকাগো চলে গেছেন। ছোট বাচ্চা যে মানুষকে এত ব্যতিব্যস্ত রাখতে পারে, তা আগে কখনো কল্পনাও করিনি। এইটুকু ছোট মানুষ, উল্টে পাশ ফেরার ক্ষমতা নেই। কিন্তু তার দাপটে আমরা দুটো বড় মনুষ্যি একেবারে তটস্থ। রাতের ঘুম, দিনের আরাম সব বন্ধ মহারাজের হুকুমে। মেজো ভাইজান, আপনার ভাগনে মোটেও আপনার মত ঠাণ্ডা হয়নি। আপনি নিশ্চয়ই তর্ক তুলবেন। তুই কি আমাকে আমার ছোটবেলায় দেখেছিলি? কেমন দুষ্টু ছিলাম, সে তো শুধু আমার মা-ই বলতে পারবে। মানি, আপনিও হয়তো বাচ্চা বয়সে এমনি দুষ্টু ছিলেন, আপনার মাকে এমনি ব্যতিব্যস্ত রাখতেন—'

'কি এত মনোযোগ দিয়ে লিখছ?'

সাকিনা চমকে মাথা তুলল, 'ওমা তুমি! কখন ঢুকেছ, টেরই পাইনি!'

'টের পাবে কি করে? যা মনোযোগ দিয়ে লিখছিলে। কাকে লিখছ?'

'মেজো ভাইজানকে।—সুমিত একটু ঘুমিয়েছে, তাই এই ফাঁকে—'

রকিব আরো কাছে এসে সাকিনার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল 'তুমি মেজো ভাইকে খুব চিঠি লেখ। উনিও দেখি খুব রেগুলার লেখেন তোমাকে।' রকিব ডান হাতের আঙুল দিয়ে চিঠিটা একটু ঘুরিয়ে পড়তে লাগল। সাকিনা অপ্রসন্ন মুখে চুপ করে রইল। কোন কোন বিষয়ে রকিব এত স্থূল যে তার ভাল লাগে না। চিঠিটা পড়ার আগে তার তো একবার বলা উচিত ছিল—পড়ব? তার খুব লজ্জা লাগে তার লেখা চিঠি অন্য কাউকে পড়তে দিতে। কতো বানান ভুল থাকে, বাক্যগঠন ঠিকমত হয় না। সে ছোট বোন আমিনা আর মেজো ভাইকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে, কিন্তু কখনো রকিবকে দেখায় না। মানে দেখানোর অবকাশ হয় না। এখানে সর্বত্র বাড়ির সামনে প্রত্যেকের আলাদা চিঠির বাক্স থাকে, চিঠি লিখে সেখানে রেখে দিতে হয়। পোস্টম্যান চিঠি বিলি করার সময় ঐ চিঠি নিয়ে যায় পোস্ট করার জন্য। রকিব হাসপাতালে থাকাকালীন সাধারণতঃ সকাল বেলাতেই সাকিনা চিঠি লিখে বাক্সে ফেলে। পোস্টম্যান রোজ

এগারোটার দিকে আসে। মা বাবা বোন বা মেজো ভাইয়ের চিঠি এলেও সাকিনাই আগে হাতে পায়। সে চিঠি পড়ে তার একটা ছোট সুটকেসে রেখে দেয়। রকিবকে লেখা চিঠি তাকে দেয়, নিজেরটা দেখায় না। এই নিয়ে কখনো সখনো রকিব হাসিচ্ছলে ঠাট্টাও করেছে। কিন্তু সাকিনার বাপের বাড়িতে কেউ কারো চিঠি পড়ে না। এই অভ্যেসটাই তার গড়ে উঠেছে। আজ সুযোগ পেয়ে রকিব তার বিনানুমতিতে চিঠি পড়ছে এমন ভাব দেখিয়ে যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সাকিনার এটা পছন্দ হচ্ছে না।

চিঠি থেকে মুখ তুলে রকিব বলল, 'মেজোভাই কি তোমার সৎভাই ?'

'মানে ?'

'এই যে লিখেছ আপনার মা-কে ব্যতিব্যস্ত রাখতেন, আপনার মা কথাটা কেন ? মেজোভাইয়ের মা কি তোমার মা নন ?'

'ও এই কথা ? মেজোভাই তো আব্বা মার পালক ছেলে। মেজো ভাইয়ের বাবা আব্বাজানের খুব জানী দোস্ত ছিলেন। মেজো ভাই হবার আগেই তিনি বাস-চাপা পড়ে মারা যান। মেজো ভাইয়ের মা অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে খুব দুরাবস্থায় পড়েন। তাছাড়া আমরা তখন কেউই হইনি, শুধু বড় ভাই একা। পাঁচ বছর হয়ে গেছে, মায়ের আর ছেলেপিলে হবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই মা খুব আগ্রহ করে মেজো ভাইকে পালক নেন। কিন্তু কি মজা জান ? দশ বছর পরে আবার আমরা তিন ভাই-বোন হলাম। আমি যখন হই তখন মেজো ভাইজানের বয়স দশ বছর। মেজো ভাইজানের কোলে পিঠেই আমি মানুষ। প্রথম অ আ ক খও শিখি মেজো ভাইজানের কাছেই। আমার পরে আরো দুটো ভাইবোন হওয়াতে মার শরীর খুব ভেঙ্গে যায়, মা আমার যত্ন নিতে পারতেন না, তাই মেজো ভাইজানই ছোট থেকে আমার দেখাশোনা করেন।'

রকিব একটু কাষ্ঠহাসি হাসল, 'খুব ইন্টারেস্টিং তো ! এত কথা আমার জানা ছিল না। আমি তো ভেবেছি মেজো ভাই তোমার আপন ভাই।'

'আপন ভাই-ই তো। এক মায়ের পেটের হয়তো নই, কিন্তু যেভাবে এক সংসারে মানুষ হয়েছি, তাতে সম্পর্ক মায়ের পেটের ভাই বোনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, বরং বেশীই।'

রকিব কেমন এক অদ্ভুত গলায় হাসতে হাসতে 'খুবই বেশী তা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না' বলে বেড রুমের দিকে পা বাড়াল কাপড় বদলাবার জন্য।

কথাটা খট করে বাজল সাকিনার কানে। সে ভ্রূ কুঁচকে রকিবের দিকে চেয়ে রইল কিন্তু কিছু বলার বা ভাবার অবসর পেল না। সুমিত

হঠাৎ জেগে কেঁদে উঠল। সাকিনা ব্যস্ত হয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। রকিব বেডরুম থেকে মুখ বের করে বলল, 'কাঁদতে না কাঁদতেই কোলে তুলে নিলে? ওতে যে ওর অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে। প্রথমে খানিকক্ষণ কাঁদতে দেওয়া উচিত, অনেক সময় বাচ্চারা দু এক মিনিট কেঁদে থেমে যায়। যদি না থামে তখন কোলে নেয়া যেতে পারে।'

সাকিনা বাচ্চাকে বুকে দোল দিতে দিতে ধমকের সুরে বলল, 'তোমার মাস্টারী থামাও তো!'

রকিব অর্ধেক জামাকাপড় খোলা অবস্থায় এঘরে চলে এল, 'মাস্টারী মানে? আমার কথার ওপর তোমার আস্থা নেই? আমি একটা ডাক্তার বটি তো?

'তাই বলে উদ্ভট সব কথা বললে মানতে হবে?'

'উদ্ভট?'

'উদ্ভটই তো। এই টুকু বাচ্চাকে আলাদা একা ঘরে শোয়াচ্ছ। জানো সারারাত আমার ঘুম হয় না।'

'সে তোমার দোষ। এসব দেশে বাচ্চারা সব সময় আলাদা ঘরে আলাদা ক্রিবে ঘুমোয়। একেবারে জন্ম থেকেই। এসব দেশে তো কাজের লোক নেই, আত্মীয় স্বজনও থাকে না আমাদের দেশের মত। বাচ্চা মানুষ করবার সমস্তটুকু দায়িত্ব পড়ে বাবা-মার ওপর। তাই একেবারে জন্মের দিন থেকেই বাচ্চার নিয়মিত অভ্যেস গড়ে তোলাতে হয়। আলাদা বিছানায় শোয়াতে হয়, রাতে শুইয়ে দেবার পর কাঁদলেও আর তুলতে হয় না—'

'ইস, কি নিষ্ঠুর নিয়ম।'

'যতটা নিষ্ঠুর ভাবছ, ততটা নয় কিন্তু আসলে। বাচ্চাটা ওই নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে যায়, ওতেই সে সুখী। তাতে মা বাবার ওপর চাপ পড়ে কম।'

সাকিনা গলায় আবদার ঢেলে বলল, 'আমি কিন্তু সুমিতকে আজ নিজের বিছানায় রাখব। কাল রাতে ও বেশ কয়েকবার কেঁদেছে।'

রকিবের মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠল, সে দ্রুত তর্জনী নাড়তে নাড়তে বলল, 'ককখনো এমন ভুল কোরো না। একবার তোমার কোলের স্বাদ পেলে ও আর কিছুতেই ক্রিবে শুতে চাইবে না। তাতে তোমারই হবে মরণ। এখানে কাজের লোক নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, তুমি সামাল দিতে পারবে না। সংসার অচল হবে, জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।'

সাকিনা স্তব্ধ কঠিন মুখে সুমিতকে বুকে নিয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত রকিবের কথামত সুমিতের ঘরেই তাকে শোয়াতে হল। পাশের দ্বিতীয় বেডরুমটা বাচ্চার নার্সারী বানানো হয়েছে। তার রেলিং ঘেরা ছোট খাট তার দোলনা, তার পেরামবুলেটার, তার খেলনা এমনকি বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় মার বসবার রকিং চেয়ার—সব দিয়ে সাজানো এই ঘর। এদেশে অন্তঃস্বত্তা মায়ের আত্মীয় বান্ধবীরা বেবী শাওয়ার উৎসব করে, তাতে সবাই বাচ্চার জিনিসপত্র উপহার দেয়। দেশের সাধ খাওয়ানোরই অন্য সংস্করণ আর কি! সুমিতের জন্মের আগে থেকেই তার জন্য কতো জামাকাপড়, খেলনা, বিছানা-বালিশ-চাদর-কম্বল, দুধের বোতল, এমনকি পেসাব-পায়খানা করার পটি পর্যন্ত! সুমিত আসার আগেই রকিব এ ঘরটার ওয়াল পেপার বদলেছে। নার্সারীর উপযোগী ছাপ ওয়ালা ওয়ালপেপার লাগিয়েছে।

হাসপাতাল থেকে আসার পর এ কয়দিনই সাকিনার ভাল ঘুম হয়নি। রোজ রাতেই সুমিত দু চারবার কেঁদেছে, ওরা দুজনেই দৌড়ে গেছে কিন্তু সুমিতকে কোলে তুলতে পারেনি সাকিনা, রকিব দেয়নি। সুমিত খানিক কেঁদে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু সাকিনার আর ঘুম হয়নি।

আজ বুঝি সে ভীষণ ক্লান্ত ছিল। হয়ত সুমিতও ক্লান্ত ছিল। রাতে একবারও কাঁদেনি। ফলে রকিব-সাকিনা দুজনেই সারারাত ঘুমিয়েছে মরার মত।

চোখ মেলেই সাকিনা দেখে সকাল হয়ে গেছে। সে চমৎকৃত হল। বাঃ সুমিতও ঘুমিয়েছে দেখি সারারাত। রকিব আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, 'দেখলে অভ্যেস হয়ে আসছে।'

ওরা দুজনেই বেশ আয়েস করে আড়মোড়া ভেংগে বিছানা ছেড়ে উঠল। আজ রোববার, রকিবের হাসপাতাল নেই। 'সুমিত দেখি এখনো জাগেনি;' বলতে বলতে সাকিনা পাশের ঘরে ঢুকল।

তার পরেই একটা আর্ত চিৎকার। রকিব চমকে লাফ দিয়ে উঠে 'কি হল?' বলে ছুটল পাশের ঘরে।

সাকিনা দু'হাতে সুমিতকে ধরে উল্টে-পাল্টে নাড়াচ্ছে আর পাগলের মত বলছে, 'সুমিত যে নড়ে না, তাকায় না, ওগো দেখ, ওর যে নিঃশ্বাস পড়ছে না।'

॥ ছয় ॥

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে এত অগ্রসর এই দেশে এরকম শিশু মৃত্যুর কথা ভাবাই যায় না। ওকল্যাণ্ড কাউন্টি মেডিক্যাল একজামিনারের অফিস থেকে বলা হয়েছে—এরকম কারণ-বিহীন শিশু

মৃত্যুকে এস আই ডি এস বা সিড্‌স্‌ অর্থাৎ সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম বলা হয়। বাচ্চার কোন অসুখ-বিসুখ নেই, বাপ-মাও রাগের মাথায় বাচ্চাকে মারধোর করেনি, ভালো বাচ্চা দুধ খাইয়ে ক্রিবে শুইয়ে দিল, পরে দেখা গেল বাচ্চা মরে রয়েছে। ওকল্যাণ্ড কাউন্টি মেডিক্যাল এগজামিনার অফিসের এক ডাক্তার বলেছিলেন ঃ এ ধরনের কেইসের কথা গত বিশ বছর থেকে জানা যাচ্ছে এবং রেকর্ড করা হচ্ছে। প্রথমে ডাক্তার এবং পুলিশ ভাবত বুঝিবা চাইল্ড-অ্যাবিউজ-এর ফলে মারা গেছে। কিন্তু পোস্ট মর্টেম করেও সে ধরনের কোন আলামত মেলেনি। পরে এ ধরনের অনেক কেইস-এর কথা শোনা যেতে লাগল।

সাকিনা জিজ্ঞেস করেছিল, 'চাইল্ড-অ্যাবিউজ কি জিনিস ?'

রকিব বুঝিয়েছিল, এদেশে শিশুরা শুধুমাত্র বাব-মার হাতে মানুষ হয়। শিশুর অসুখ বিসুখের সময় সে কাঁদে, জেদ ধরে বাবা-মাকে রাত জাগায়। কয়েকদিন পরিশ্রম ও রাত জাগার পর অনেক সময় ধৈর্য হারিয়ে বাবা কিংবা মা কেউ বাচ্চাকে আঘাত করে বসে। অনেক সময় আঘাতে বাচ্চা মরেও যায়! তাছাড়া অনেক বাবা-মা হয়তো বেশী মদ খায় বা ড্রাগ খায়, তারাও অনেক সময়—

সাকিনা শিউরে উঠে বলেছিল, 'থাক আর শুনতে চাই না।'

তার মন কিছুতেই প্রবোধ মানছিল না। বাবা-মা ভাই বোন সবাই চেয়েছিল সাকিনার প্রথম বাচ্চা দেশেই হোক। কিন্তু রকিব প্রবল আপত্তি জানিয়ে লিখেছিল, তাদের বাচ্চা আমেরিকাতেই হবে। কারণ দেখিয়েছিল, দেশের হাসপাতালগুলোতে অব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্নতা, ডাক্তারদের হৃদয়হীন উদাসীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমেরিকাতে শিশু মৃত্যু নেই বললেই চলে। এখানকার হাসপাতাল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, ব্যবস্থা নিখুঁত, ডাক্তাররা নিবেদিত প্রাণ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই উন্নত অগ্রসর আমেরিকাতে তার বাচ্চা মারা গেল তার সুন্দর সাজানো নার্সারীতে রেলিং ঘেরা বিছানাতে শুয়ে নিঃশব্দে, তাদের অজান্তে। এ দুঃখ সে রাখবে কোথায় ? এখন তার মনে হচ্ছে, সেই বা কেন রকিবের যুক্তি মেনে নিয়ে এদেশে আসতে রাজী হয়েছিল ? কেন সে মার কাছে থাকতে চেয়ে রকিবকে বুঝিয়ে লেখেনি ? রকিবের সান্নিধ্যে আসার জন্য তার দেহমন এতই আকুল হয়ে উঠেছিল যে ভবিষ্যতের কোন অসুবিধের কথাই মনে ঠাঁই পায়নি ?

এখন বাবা মা শ্বশুর শ্বাশুড়ী—ওরাই বা ভাববেন কি ? কোন রোগ বালাই নয়, কোন এ্যাকসিডেন্ট নয়, এমনি এমনিই বিছানায় শুয়ে মরে গেল ? নিশ্চয় নাকে মুখে কম্বল চাপা পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা

গেছে। নিশ্চয় সাকিনা ঠিকমত বাচ্চার দেখাশোনা করেনি।
রকিবও পড়েছে ফ্যাসাদে। তার নিজের শোকের কথা সে ভুলেই গেছে। তাকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে সাকিনার প্রতি। সাকিনা খাচ্ছে না, ঘুমোচ্ছে না, নার্সারীতে রকিং চেয়ারে বসে অনবরত দোল খাচ্ছে আর শূণ্য ক্রিবটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার দুই চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, চোখের নিচে কালি, চুল আঁচড়ায়নি এ কয়দিন। তার এখনো ধারণা সুমিত নাকে কম্বল চাপা পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। ডাক্তাররা যে পোস্টমর্টেম করে দেখেছেন শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়নি, তাও সে বিশ্বাস করেনি। সুমিতকে নিজের কাছে নিয়ে শুলে এরকমটি হতে পারত না, রকিব তা করতে দেয়নি, সুমিতের মৃত্যুর জন্য সে যেন প্রকারান্তরে রকিবকেই দায়ী করছে। সাকিনা কখনো মুখফুটে একথা বলেনি কিন্তু তার হা-হুতাশ শুনে সেরকমই মনে হচ্ছে। সেটাও রকিবের জন্য কম অস্বস্তির নয়।
রকিব আস্তে করে ওর কাঁধে হাত রেখে মৃদু আদরের স্বরে বলল, 'চলতো গোসল করে নাও। আমরা বাইরে বেরুব।'
সাকিনা ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল। রকিব ওর কপালের চুল সরিয়ে বলল, 'লেকের ধার দিয়ে গাড়িতে ঘুরব। গাছের পাতার রঙ বদলাচ্ছে, দেখবে তোমার ভাল লাগবে।'
আজ কেন জানি, সাকিনা নীরব আপত্তিতে বসে রইল না। উঠে ক্লোজেট থেকে কাপড়-জামা বের করে বাথরুমে ঢুকল। রকিব রান্না ঘরে গেল, এই ফাঁকে তাড়াতাড়ি কয়েকটা স্যান্ডুইচ বানাতে। সাকিনা গোসল করে বেরোলে যদি খাওয়াতে পারে।
লেকের ধার দিয়ে গাড়িতে ঘোরা সাকিনার খুব পছন্দ। পছন্দ চীজ স্যান্ডুইচও। রকিব লুচির মতো আকারের হলুদ রঙের চেডার পনীর দিয়ে সাকিনার পছন্দের স্যান্ডুইচ বানালো—যদি খায়।
রকিবের আশা পূরণ করে সাকিনা স্যান্ডুইচ খেল। সে একটা যেমন তেমন নাইলন শাড়ি পরেছে, চুল ভালো করে আঁচড়ায়নি, মুখে দেয়নি কোন প্রসাধনী। অন্য সময় হলে এরকম সাদামাটা বেশে সাকিনাকে নিয়ে বেরোতে রকিব রীতিমত আপত্তি করত, আজ কিছু বলল না। সে যে বেরোচ্ছে এই যথেষ্ট।
বেরোবার আগে রকিব সাকিনার একটা শাল বের করে নিল ক্লোজেট থেকে। অক্টোবর মাসে একটু একটু ঠাণ্ডা, রকিব বেশ কয়েক বছর এদেশে আছে, তার এখনো গরম কাপড় লাগে না। কিন্তু সাকিনা এ বছরই প্রথম এসেছে গরম দেশ থেকে। তার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। শালটা ওর পিঠ ও দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে এক হাতে

ওকে আলতো করে ধরে বলল 'চল।'

মিশিগান অসংখ্য লেকের জায়গা। কোন কোন এলাকায় কয়েকটা লেক যেন জড়াজড়ি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে আছে। বিশেষ করে ব্লুমফিল্ড হিলস, ওয়েস্ট ব্লুমফিল্ড, পন্টিয়াক, এসব এলাকায়। রচেস্টারের কাছাকাছি তেমন লেক নেই, রকিব সোজা গাড়ি চালিয়ে ওয়েস্ট ব্লুমফিল্ড-য়ে চলে গেল। ওখানে পাইন লেকটা সার্পেন্টাইন—সাপের মত এঁকেবেঁকে গেছে। লেকের পাড়ের রাস্তা দিয়ে রকিব খুব ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে লাগল, বাঁয়ে লেক, ডাইনে সার সার প্রাইভেট বাড়ি। সামনে অনেকখানি লন নিয়ে বিরাট বাড়িগুলো। লনে এবং রাস্তার পাশে বিরাট বিরাট গাছ। রাস্তাগুলো বেশী চওড়া নয়, অনেকটা প্রাইভেট রোডের মত, গাড়ির ভীড় খুব বেশী নয়। তাই আস্তে চালালেও কোন অসুবিধে নেই।

ডানদিকে তাকিয়ে রকিব বলল, 'বাড়িগুলো দেখ। কি সুন্দর! ওই রকম একটা বাড়ি জীবনে কোনদিন আমি কিনবই।'

সাকিনা সায় দিয়ে বলল, 'সত্যি, খুবই সুন্দর বাড়িগুলো। কোন কোনটায় আবার চওড়া বারান্দা। ওই বারান্দায় বসেই তো সারাদিন লেকের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দেয়া যায়।'

'যা অসম্ভব দাম না বাড়িগুলোর। শুনলেও ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়। এখানে খুব বড়ো লোকেরা বাস করে। কিন্তু আমি তো ডাক্তার—আমিও একদিন খুব বড়লোক হব, আর এখানকার একটা বাড়ি কিনব।'

সাকিনা টিপ্পনী কাটল, 'খালি বড় লোক হবার স্বপ্ন।'

রকিব প্রতিবাদে গলা চড়িয়ে বলে উঠল, 'কেন কেন দোষ কি তাতে? যতই বলনা, যাই বল না কেন, টাকা না থাকলে জীবনে কোন সুখ নেই, সার্থকতা নেই।'

আগে হলে এই নিয়ে সাকিনা তুমুল তর্কে মেতে উঠত, আজ কোন কথা বলতেও ইচ্ছে হল না। বরং প্রসঙ্গ এড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এদিকে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া পাওয়া যায় না?'

'যায়, তবে খুব কম। আর ভাড়াও তার আকাশ ছোঁয়া।'

পাইন লেক এঁকেবেঁকে খানিক সামনে গিয়ে যেখানে হঠাৎ বাঁয়ে ঘুরে গেছে, সেখানে ডানদিকে আবার শুরু হয়েছে অর্চার্ড লেক। পাইন লেকের শরীর নদীর মত, অর্চার্ড লেককে মনে হয় বিশাল একটা পুকুর। রাস্তাটা বাঁয়ে বেঁকে পাইন লেকের পাশাপাশি চলে গেছে, আবার এখান থেকেই আরেকটা রাস্তা বেরিয়ে ডান দিকের অর্চার্ড লেকের গা ঘেঁষে এগিয়ে গেছে। এই তেমাথার মোড়ে একটা ছোট্ট

ঘর—অর্চার্ড লেকে বেড়াবার জন্য বোট ভাড়া নেবার অফিস। এখানে গাড়ির গতি আরো কমিয়ে রকিব জিজ্ঞেস করল, 'ডাইনে না বাঁয়ে ?'

'বাঁদিকেই চল। তারপর ঘুরে অর্চার্ড লেকের ওপাশ দিয়ে আবার এদিকে আসা যাবে তো ?'

গাড়ির গতি বাঁদিকে প্রবাহিত করে রকিব বলল, 'তা যাবে। 'রাস্তাটা অর্চার্ড লেককে বেড় দিয়েছে তো। যদি চাও, ফিরে এসে এখান থেকে বোট ভাড়া করে লেকে খানিকক্ষণ ঘুরতেও পারি।'

আগে ওরা মাঝে মাঝে বোট ভাড়া করে লেকে ঘুরেছে। কিন্তু এখন সাকিনা প্রস্তাবটায় কান দিল না, এখন তার মাথায় অন্য কথা ঘুরছে। তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য রকিব আবার বলল, 'রাস্তার পাশের গাছগুলো লক্ষ্য কর—কি রঙের বাহার। লাল, হলুদ, কমলা, বাদামী—এখানে ফল সীজনের যা বাহার না।'

সাকিনা আনমনে জিজ্ঞেস করল, 'ফল সীজন কেন বলে ? পাতার রঙ বদলায় কেন ?'

'শীতে এইসব গাছের পাতা ঝরে যায়, ঝরে মাটিতে পড়ে তো, তাই বোধহয় ফল বলে। আর ঝরার আগে কেন যে এ রকম বাহারের রঙ হয়, তা বলতে পারব না।'

'বিলেতে বলে অটাম। আচ্ছা শোনো, একটা কথা মাথায় ঘুরছে। বলেই ফেলি। এদিকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিলে হয় না ? রচেস্টারে ওই কবরের মত বাসায় থাকতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কেন যে বেইসমেন্ট অ্যাপর্টেমেন্ট নিয়েছিলে !'

সাকিনা এর আগেও দু'বার জিজ্ঞেস করেছে। রকিবের জবাবও ছিল—অর্থনৈতিক কারণে। বেইসমেন্ট ফ্ল্যাটগুলো অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় পাওয়া যায়। সে এখনো রেসিডেন্সি করছে, পুরো ডাক্তার হতে এখনো এক বছর দেরী আছে। বছরে বেতন পায় ছাব্বিশ হাজার মাত্র। কিন্তু আজ সে তৈরি জবাবটা দিতে পারল না। সাকিনার যা মনের অবস্থা। মিনমিন করে বলল, 'একটু আগে বললামই তো লেকের ধারের ফ্ল্যাটের ভাড়া বড্ডো বেশী—'

সাকিনা হঠাৎ স্বরে তীব্রতা এনে বলল, 'লেকের পাড়ে না হোক, লেকের পাড়াতে তো কম ভাড়ায় থাকতে পারে ! আসলে তুমি খোঁজোনি।'

রকিব স্বীকার করল সে খোঁজেনি বটে। তবে সাকিনাও তো তেমন করে বলেনি।

'বেশ তো আজ বললাম। রচেস্টার আমার একদম ভালো লাগে না। এমন জায়গায় একটা বাসা নাও, যেখান থেকে হেঁটে আমি লেকের

ধারে বেড়াতে যেতে পারব।'

'তা না হয় নেব। কাল থেকেই খুঁজব। তবে হাঁটবে কেন? দেখ না, তোমাকে শীগগীরই গাড়ী চালানো শেখানোর ব্যবস্থা করছি।'

'সত্যি?' এক সপ্তাহ পরে এই প্রথম সাকিনার চোখে খুশী ঝিলিক দিল, ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি।

'সত্যি, একটা ড্রাইভিং স্কুলে তোমাকে ভর্তি করিয়ে দেব। দেখবে, খুব তাড়াতাড়ি শিখে যাবে। তারপর তোমাকে একটা গাড়ী কিনে দেব।'

'গাড়ী? আমাকে? অত টাকা পাবে কোথায়?'

'এখানে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ী বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। একটু খোঁজাখুঁজি করলে বাজেটের মধ্যেই ভালো গাড়ী পাওয়া যাবে। তখন তোমার আর একা লাগবে না। নিজেই যখন খুশী, যেখানে খুশী যেতে পারবে।'

॥ সাত ॥

নতুন বাসা দেখে সাকিনার বুকের ভেতর জমাটবাঁধা নিঃশ্বাসগুলো যেন গলে গলে ঝরে বেরিয়ে গেল। চমৎকার দোতলা বাসা, ফ্ল্যাট নয়, কণ্ডোমিনিয়াম। নিচে ড্রয়িং-ডাইনিং, কিচেন, বেশ প্রশস্ত। দোতলায় বড় দুটো বেডরুম, বাথরুম। মাটির নিচের বেইসমেন্টটাও যথেষ্ট ফাঁকা পড়ে আছে। পেছনে এক চিলতে বাগানের জমি, সামনে ছোট একটা ঘাসে-ঢাকা লন। দোতলায় মাস্টার বেডরুমটার সঙ্গে আবার ছোট একটা ঝুল বারান্দাও আছে। বারান্দায় দুটো নাইলনের ফিতেয় বোনা ফোল্ডিং চেয়ার পাতা আছে। রকিব বলল, 'বাড়ীঅলা ও দুটো আমাদের দিয়ে গেছে।'

'নিচের ঘরেও একটা লম্বা সোফা দেখলাম, ওটাও কি বাড়ীঅলা দিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, ও নতুন বাড়ীতে নতুন ফার্নিচার কিনেছে। এ বাড়ীর জিনিসপত্র যতটা পেরেছে, বিক্রি করেছে। যেগুলো রয়ে গেছে, আমাদের দিয়ে গেছে।'

'খুব বড়লোক বুঝি? একটা বাড়ী থাকতে আরেকটা বাড়ী কিনেছে?'

'বড়লোক তো বটেই। তবে মজা কি জান? এদেশে বাড়ী কিনতে খুব বড়লোক হতে হয় না। এই ধরনের কণ্ডোমিনিয়াম জীবনের প্রথম কয়েকবছর চাকরি করার পরেই কেনা যায়। কারণ পুরোটা নগদ টাকা দিয়ে তো কিনতে হয় না। প্রথম চোটে পুরোদামের পঁচিশ

পার্সেন্ট নগদ দিয়ে বাকী টাকা বিশ-পঁচিশ বছর ধরে মাসে মাসে শোধ করতে হয়। আরো মজা কি জান? বড়লোকরা যে বিরাট বাড়ি কেনে, তারাও ঐ প্রথমে ২০-২৫ পার্সেন্ট নগদ দেয়, বাকি টাকা তারাও ২০-২৫ বছর ধরে মাসে মাসে শোধ করে। সারা দেশ জুড়ে একই পদ্ধতি।'

'কেউ যদি বাড়ী বিক্রি করতে চায়?'

'যে কিনবে, সেও প্রথমে কিছু হোক নগদ দেবে। তারপর ঐ কিস্তি-সহই কিনবে।'

'ভারি মজা তো। অথচ আমাদের দেশে দেখ, একটা বাড়ী করতে লোকের সারাজীবনের সঞ্চয় চলে যায়, বাড়ী বানানোর চিন্তায় মাথার চুল পেকে যায়, ব্লাড প্রেসার হয়ে যায়!'

'হ্যাঁ, এখানে এই সুবিধে। নিজেদের কষ্ট করে বাড়ী বানাতে হয় না। তৈরি বাড়ী পাওয়া যায়।'

'আমরাও তো তাহলে কয়েকবছর পরে কিছু টাকা জমিয়ে এই বাড়ীটাই কিনে নিতে পারি।'

রকিব গম্ভীর হয়ে বলল, 'কণ্ডো আমি কিনব না। কিনলে বাড়ীই কিনব।'

'সে আবার কি? কণ্ডো আর বাড়ীতে তফাৎ কি?'

'কন্ডো হল কম রোজগেরে লোকদের বাসস্থান। কন্ডো যারা কেনে তারাই টাকা বেশী হলে বিক্রি করে দিয়ে বাড়ী কেনে। বাড়ীর আলাদা স্ট্যাটাস। আমি তো ডাক্তার। আমার টাকা হতে সময় লাগবে না। আমি প্রথম চোটেই বাড়ী কিনব।'

সাকিনার ভালো লাগাটা একটু চিড় খেল। কিন্তু নতুন বাসায় আসার আনন্দ সে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল—

'যাই বল, লোকটা কিন্তু ভাল। আমাদের খুব কম ভাড়ায় দিয়েছে। মাত্র পৌণে চার শো ডলারে এত বড় বাড়ীটা।'

রকিব একটু চিন্তিত গলায় বলল, 'বেইসমেন্টে একটু ক্র্যাক আছে এককোণে। বাড়ীঅলা বলেই দিয়েছে, মাঝে মধ্যে মেরামত করতে যা লাগবে আমিই যেন খরচ করি, তাই ও এত কম ভাড়ায় দিয়েছে। ও এইসব মেরামতের ঝামেলা—টামেলা করতে পারবে না।'

'এ দেশে সব বাড়ীতেই বেইসমেন্ট করে। মাটির এত নিচে ঘর, বিষ্টির সময় পানি ঢোকে না?'

'তার সব ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া এদেশে বৃষ্টি হয়ও কম।'

'হ'তো বাংলাদেশের মতো তোড়ে একশ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত, তাহলে আর বেইসমেন্ট বানাতে হত না।' বলতে বলতে সাকিনা খিলখিল করে

হাসল। সে বারান্দাতেই বসে রইল বহুক্ষণ। সামনে রাস্তা, তারপরেই বিরাট একটা মাঠ—ওটার জন্যই এ জায়গাটা এত খোলামেলা লাগে। মাঠ পেরিয়ে ওধারে বড় বড় গাছ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীর মাথা দেখা যাচ্ছে। পেছন দিকেও বিরাট বিরাট মহীরুহের মত গাছ। দেখতে খুব ভালো লাগে। ফল সীজনের পাতার রঙ বদলের সমারোহ শেষ হয়ে গেছে। এখন বেশীর ভাগ গাছই পত্রশূন্য। মাটিতে ঝরা পাতার ডাঁই। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে হু হু বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পরেই বরফ পড়া শুরু হবে। সাকিনা শুনেছে কোন্ কোন বছর এত বরফ পড়ে, মাটির ওপর তিন-চার -ছয় এমনকি দশ-বারো ফুটও বরফ জমে যায়। এই শীতে রচেস্টারের ওই মাটির নিচের ফ্ল্যাটে থাকলেই হয়েছিল আর কি। কোনদিন সকালে উঠে দেখত মাটির ওপর ছয় সাতফুট বরফ জমে তাদের গোটা জানালাটাই ঢেকে গেছে। উঃ মা গো, খুব ভাল সময়ে তারা বাসা বদলাতে পেরেছে।

রকিব ডাকল, 'এই, নিচে এসো। চল, বাইরে গিয়ে হাঁটি।'

বেশ কয়েকদিন পরে আজ রোদ উঠেছে। তার ওপর রোববার। ওরা দু'জনে নেমে পেছনদিকের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখে—অনেক বাড়ী থেকেই লোকজন বেরিয়ে হাঁটা হাঁটি করছে। তিন চারটে ছোট ছেলেমেয়ে দৌড়ো দৌড়িও করছে। এক মোটা ভদ্রমহিলার সঙ্গে এক বিরাট কুকুর দেখে সাকিনা হঠাৎ কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভদ্রমহিলা হেসে কুকুরটার গলায় বকলস ধরে বলল, 'ভয় নেই, ও খুব ভাল। আপনাকে কামড়াবে না।' পাশ দিয়ে যাবার সময় কুকুরটা সাকিনার শাড়ী শুঁকে দিয়ে গেল। ভদ্রমহিলাকে এ ধরনের পরিস্থিতি বোধহয় প্রায়ই মোকাবেলা করতে হয়। আরেকটু এগোতেই এক ভদ্রলোক হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বলল, 'হাই! আমার নাম আর্নি। আমি এই বাসাটাতে থাকি। আপনারা গত সপ্তাহে এলেন বুঝি?'

রকিব তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের নাম বলল, সাকিনাকে পরিচয় করিয়ে দিল। সাকিনা অবাক হল। রচেস্টারে থাকতে এমনটি কখনো ঘটেনি। সত্যি বলতে কি, ওখানকার কোন ফ্ল্যাটের বাসিন্দার সঙ্গেই তাদের আলাপ পরিচয় হয়নি। সে খুব খুশী হল এই ভেবে যে এ পাড়ার লোকগুলো অত আত্মকেন্দ্রিক নয়।

কথায় কথায় জানা গেল, আর্নির আদি দেশ কলাম্বিয়া। সাকিনাও লক্ষ্য করল এর গায়ের রঙ এদেশী লোকের মত ফ্যাকাসে সাদা নয়, মাখনের মত বাসন্তী-সাদা। নাকচোখের গড়নেও একটু অন্যরকম ভাব আছে।

আর্নি জিজ্ঞেস করল 'আপনারা কি ইণ্ডিয়ার লোক?'

রকিব হেসে ফেলল, 'না, আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। অবশ্য এই ভুলটা সবাই করে!'

'ব্যাংলাডেশ? আরে, এখানে তো আরেকজন থাকেন ব্যাংলাডেশের। দাঁড়ান, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' আর্নি দুটো বাড়ীর পরের একটা বাড়ীর দরজায় গিয়ে বেল টিপল। একটি মেয়ে বেরিয়ে এল, আর্নি বলল, 'ফ্রিডা, সাইফ আছে? এই দেখ এরা দু'জন সাইফের দেশের লোক! এখানে কণ্ডো ভাড়া নিয়েছে।'

মেয়েটি ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে 'সাইফ সাইফ এখানে এস' বলে চৌকাঠ থেকে নেমে এল ওদের সামনে। আর্নি পরিচয় করিয়ে দিল 'ফ্রিডা, সাইফের বউ।'

সাকিনা লক্ষ্য করল এ মেয়েটিরও গায়ের রঙ বাসন্তী-সাদা, প্রায় চাঁপা ফুলের রঙ। চুল ঘন বাদামী—প্রায় কালোর পর্যায়ে, এবং চোখের রঙ গাঢ় বাদামী হলেও ভুরু দুটি অদ্ভুত কুচকুচে কালো। একটু পরেই সাইফ এল, পরিচয় হল। ওইখানে রাস্তার ওপর চমৎকার একটি জটলা জমে উঠল। সাকিনার বুকটা খুব হালকা হয়ে গেল। একই পাড়ায় একটি বাঙ্গালী বাস করে, হোক না তার স্ত্রী এদেশী, তবুতো বাংলায় কথা বলার জন্য একজন লোক মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরের বাসাতে রয়েছে।

।। আট ।।

চারদিক বরফে ছেয়ে রয়েছে। লেকের পানি জমে কাচের মত দেখায়। সামনের লন, পেছনের বাগান, দূরের ওই মাঠ—সব সাদা। ছোট বড় সব গাছের মাথাগুলোয় বরফ জমে নানারকম আকৃতি নিয়েছে। কেবল রাস্তাগুলোয় গাড়ী করে নুন ছিটিয়ে দিয়ে যায়। গলে যাওয়া বরফ রাস্তার দুপাশে জমে বাংলাদেশের কাদার মতো রঙ নিয়ে পড়ে থাকে।

সাকিনার খুব একা লাগে। উইক-ডেতে সারাদিনই প্রায় বসার ঘরে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। রান্নাবান্নায় সময় বেশি লাগে না, ঘরদোর গোছানোও তেমন কিছু নয়, কারণ অগোছালো করার লোক তো নেই বাড়িতে। বরফের জন্য বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে পারে না। বরফ জমা ঠাণ্ডাটা এখনো তার ধাতস্থ হয়নি। সাতপুরু গরম কাপড় পরে বেরোলেও খানিক পরে মনে হয় রক্ত সব জমে গেছে। তাছাড়া বরফে আছাড় খাবারও ভয় আছে। রাস্তাটা নুন ছিটোনো গাড়িগুলো সাফ করে দিয়ে যায়। কিন্তু বাড়ির দরজার সিঁড়ি আর

বাগানের বরফ সাফ করার দায়িত্ব বাড়ির বাসিন্দাদের। রকিব সিঁড়ি আর বাগান মাঝে মাঝে সাফ করে। সে তো বরফের ওপর দিয়েই দিব্যি হেঁটে যায়। সাকিনা তার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার সময় রকিবের হাত ধরে সাবধানে বরফের ওপরের ওই কয়টা পদক্ষেপ পার হয়। আরো কয়েকজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, লুচিয়া, রিভা, রোজ, প্যামেলা। কিন্তু এখন ওরা নিজে থেকে তার বাসায় না এলে সে বরফ মাড়িয়ে যেতে ভয় পায়। ওরাও খুব বেশি আসে না। এদেশের সবাই বড়ো ব্যস্ত। ফ্রিডা একটু বেশি আসত, তা সেও গেছে বাংলাদেশে বেড়াতে—এক মাসের জন্য। ইস, সে যদি যেতে পারত ফ্রিডার সঙ্গে। এখানে তার সবচেয়ে বেশি ভাব হয়েছে ফ্রিডার সঙ্গে। মেয়েটির আদি দেশ গ্রীসে—দুই পুরুষে আমেরিকাবাসী। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মেয়ে। সে কারণে ওর গায়ের রঙ চাঁপাফুলের মত। ভুরু কালো কুচকুচে। খাস আমেরিকান নয় বলেই বোধহয় সে অন্য আমেরিকান মেয়েদের চেয়ে বেশি মিশুক। ফ্রিডার পাশের বাড়িতে থাকে লুচিয়া, তারো আদি দেশ ইটালীতে। সেও দুই পুরুষে আমেরিকা-বাসী। তারো গায়ের রঙ মোলায়েম মাখনের মত, ভুরু কালো। সেও খুব মিশুক কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এরা সবাই চাকরি করে। এখন ফোনেও খানিক গল্প করা যাবে না। অবশ্য রোজ চাকরি করে না। তাকে ফোন করে খানিক গল্প করা যায়। কিন্তু মুশকিল হল, সামনা-সামনি ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে যদিবা সে ওদের কথা মোটামুটি বোঝে ফোনে খুব কম বোঝে।

সুমিতটা যদি থাকত, তাহলে তার সময় কোথা দিয়ে কেটে যেত টেরই পেত না। সুমিতের জন্য বুকটা টনটন করে উঠল। বাড়ি বদলানোর উত্তেজনায় নতুন ভালোবাসার সুখে কিছুদিন শোকটা একটু চাপা পড়েছিল। রকিবও যেন কিছুদিন খুব বেশী মনোযোগী, খুব বেশি বিবেচক হয়ে উঠেছিল। বাসায় থাকতও বেশি। হাসপাতাল থেকে ছুটিও নিয়েছিল একটু ঘন। তাছাড়া এর মধ্যে ক্রিসমাসের ছুটি গেল। সে সময়টাও খুব হৈচৈতে কেটেছে। ২৫ ডিসেম্বর এদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান—যিশুখৃষ্টের জন্মদিন—এরা উচ্চারণ করে যিশাস ক্রাইস্ট। সারা দেশটা যেন উৎসবে মেতে উঠে। তোড়জোড় শুরু হয় নভেম্বর মাস থেকেই। তার জের চলে ৩১ ডিসেম্বর নববর্ষের রাত পর্যন্ত। এদের উৎসবে এরা প্রবাসীদেরও টেনে নেয়। ক্রিসমাসের ডিনারে চেনাজানা সবাইকে ডাকে। অন্য ধর্মের প্রবাসীরাও নিউ ইয়ার্স ইভ অনুষ্ঠানটা খুব জাঁকিয়ে করে। তা সেই কটা দিনের উৎসব শেষ হতেই আবার যে-কে-সেই। চারদিকে বরফের মধ্যে বন্দিনী একাকী সাকিনা। এখন আবার রকিবের কাজের

চাপ বেড়েছে। ভোর সাতটায় বেরিয়ে যায়। ফিরতে ফিরতে কোনদিন রাত সাতটা আটটা। প্রায় প্রতি শনিবারেই কাজ করতে হয়।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সাকিনা। সুমিতের জন্য হাহাকারে বুকটা যেন খান খান হয়ে যাচ্ছে। কি করে কাটাবে সে জীবন এই নির্বান্ধব, নিরানন্দ, নির্জন বিদেশে?

ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। সাকিনা চমকে কান্না থামিয়ে চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেল। রান্নাঘরের দেয়ালে ঝোলানো ফোনের রিসিভার তুলে ভারী গলায় বলল, 'হ্যালো।'

'কি করছিলে? ঘুমুচ্ছিলে নাকি? ফোন ধরতে এত দেরী হল যে?'

'ঘুমুইনি।'

'গলা ভারী কেন? নিশ্চয় মন খারাপ করে কাঁদছিলে?'

রকিবের গলার সামান্যতম সহানুভূতিতে আরো একরাশ পানি ঝরে পড়ল সাকিনার দুই চোখ দিয়ে। সাকিনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠল, 'আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না। এত একা একা থাকা যায়?'

'জানি সোনা, কত কষ্ট তোমার। কিন্তু কি করব বলো? আর দুটো মাস—তার পরেই সব বরফ গলে যাবে, চারদিকে গাছে গাছে নতুন পাতা গজাবে, ফুলগাছে কুঁড়ি আসবে—বসন্তকালের আর দেরী নেই। তখন তোমার খুব ভাল লাগবে। এদেশে শীতকালে সবারই একই অবস্থা। এই জন্যই তো এখানে শীতেই ভাল ভাল প্রোগ্রাম থাকে টিভিতে। টিভি দেখ না কেন বসে? ২৪ ঘন্টাই তো টিভি চলে।'

'কি জন্যে ফোন করেছিলে?'

'এমনি। কি করছ খোঁজ নিতে। ভাগ্যিস করেছিলাম। এইতো কাঁদছিলে একা একা। ও হ্যাঁ, শোন একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। বাড়িতে একটা ডিনার লাগালে কেমন হয়? আমার এক পুরনো বন্ধু ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেছিল, সে আবার ফিরে এসেছে নতুন বউ নিয়ে। শনিবার রাতে ওকে দাওয়াত করি? ওই সঙ্গে আনি আর সাইফকে। কি বল?'

'মন্দ কি?'

'তাহলে ওই কথা রইল। আমি সন্ধ্যেয় এসে সব ঠিক করব। তুমি এর মধ্যে ভাবতে থাক কি কি রাঁধবে।'

॥ নয় ॥

রকিবের বন্ধুটি ভারী মজার। খুব কথা বলে, হা হা করে হাসে, যেখানে বসে, সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে। তার বউটি ঠিক উল্টো। লাল চুল, লম্বা পাতলা শরীর নিয়ে ভারি সুন্দরী সে, চোখের দৃষ্টি রহস্যময়, ঠোঁটের কোণে মৃদু মৃদু হাসি কিন্তু কথা বলে খুবই কম।

স্ট্যানলিকে সাকিনার বেশ ভাল লেগে গেল। তার আরো একটা কারণ—স্ট্যানলির উচ্চারণ খুব পরিষ্কার, সাকিনা বেশ বুঝতে পারে। এখন সেও মোটামুটি গড়গড় করে আমেরিকান ইংরিজি বলতে পারে। আগে ভয় ছিল যদি ভুল বলে ফেলে, তাই মুখে কথা আসত না। রকিব বকেবকে সেটা ঘুচিয়েছে। 'ভুল হয় হবে, তাতে তোমাকে কেউ কিছু বলবে না, তোমার পণ্ডিতি নিয়েও কারো মাথাব্যথা নেই। বলে এখানকার খোদ আমেরিকানরাই হরদম কতো ভুল বলে যাচ্ছে। কে তার তোয়াক্কা করে?' এতে একটা ফল হয়েছে। ভুল হোক, যাই হোক, সাকিনা যা বলতে চায়, গড়গড়িয়ে বলতে পারে। সত্যিই, এদেশে এরা ভুল শুনে কেউ হাসে না বা টিটকিরি দেয় না। সাকিনার মনে পড়ে, দেশে থাকতে কোন অবাঙালীর মুখে ভুল বাংলা শুনে লোকে হেসেছে, হেসে হেসে তক্ষুণি বেচারার মুখের ওপর বারে বারে তাকে শুধরে দিয়েছে। এখানে এই ব্যাপারটা নেই। সাকিনা নিজেই বুঝতে পারে, তার বাক্য গঠনে ভয়ানক রকম বেচাল হয়ে যাচ্ছে, তবু এখানকার মানুষে যেন সেটা খেয়ালই করে না। এটা মস্তো একটা স্বস্তি এনে দিয়েছে তার মনে।

খেতে বসে স্ট্যানলি প্রতিটি খাবারের নাম ও রন্ধনপ্রণালী জেনে নিচ্ছিল সাকিনার কাছ থেকে। সাকিনার বাড়িতে এই প্রথম লোকে দাওয়াত খাচ্ছে, তার মধ্যে একজন আবার বাঙালী। সে মনের সুখে রেঁধেছে পোলাও, কোর্মা, কিমাভুনা, মাছের দোপেঁয়াজা, আলু-কপি ভাজি, বেগুনের দোলমা। স্ট্যানলি প্রতিটি পদ আলাদা করে নিয়ে খেল এবং খেতেখেতে সাকিনাকে রেসিপি জিজ্ঞেস করে নিল। রকিব অবাক হয়ে বলল, 'রেসিপি জিজ্ঞেস করে তোমার কি লাভ স্ট্যান? তুমি কি এসব নিজে রাঁধতে পারবে কোনদিন?'

স্ট্যানলির বউ মিরান্ডা মুচকি হেসে বলল, 'বোট বিক্রি করার পর ও রান্নাবান্না নিয়ে মেতেছে।'

স্ট্যানলি গলা উঁচু করে বলল, 'দেড় বছরে আমি বহুত মেক্সিকান রান্না

শিখে ফেলেছি স্যানডিয়েগোতে।'

সাকিনা জিজ্ঞেস করল, 'বোট বিক্রি করার ব্যাপারটা কি?'

স্ট্যানলি বলল, 'এখানে আমার নিজের একটা বোট ছিল। মিশিগান লেকের দেশ তো। এখানে বহুত লোকে বোট রাখে। লেকে ঘোরে, ওয়াটার-স্কী করে, বোট-রেস লাগায়। কেন রকিব তোমাকে বলেনি—কতোদিন ও আমার সঙ্গে বোটে করে লেকে বেড়িয়েছে।'

সাকিনা হেসে বলল, 'না আমি আসার আগে ও এখানে কি করত, কিছুই বলেনি।'

স্ট্যানলি আর মিরাণ্ডা দু'জনেই যেন একটু বিষম খেল। রকিব হঠাৎ 'আরে সাইফ আপনি কিছুই নিচ্ছেন না যে, এই যে আর্নি—বাঙালী খাবার কি খেতে পারছেন?' এসব বলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সমস্ত ব্যাপারটাই সাকিনার চোখে ঠেকল। কি ব্যাপার? সে খুব সরলভাবেই কথাটা বলেছিল, তার প্রতিক্রিয়া এরকম হবে, আশা করেনি। তবে কি—

সাকিনা মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠল, 'ঝাল বোধহয় বেশি হয়ে গেছে, তাই না? আমরা আবার ঝাল একটু বেশি খাই। তবে আপনাদের জন্য ঝাল কমই দিয়েছি।'

স্ট্যানলি বলল, 'কোন চিন্তা করবেন না, মেক্সিকান খাবার এর চেয়েও ঝাল হয়। উঃ, যা মজা খেতে।'

খাওয়া শেষে সবাই সাকিনাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলে সে হেসে বলল, 'আপনারা সবাই ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলেই আমাকে বেশি সাহায্য করা হবে। আমি ওঘরেই ডিজার্ট সার্ভ করব।'

স্ট্যানলি উৎসুক চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'কি ডিজার্ট বানিয়েছেন? আপনাদের দেশের কোন স্পেশিয়ালিটি নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, আমাদের দেশের স্পেশাল একটা মিষ্টি, একে বলে পায়েস।' সাকিনা ফ্রিজ খুলে পায়েসের বাটি বের করতেই স্ট্যানলি সেটার ওপর ঝুঁকে পড়ল 'রাইস পুডিং?' তার কন্ঠস্বরে হতাশা।

'না, না আপনাদের যেটা রাইস পুডিং, সে রকম বাজে এটা মোটেও নয়। এটা খেজুর গুড় দিয়ে বানানো। খেজুর গুড় খেজুর গাছের রস দিয়ে তৈরি হয়। আপনাদের যেমন মেইপল সিরাপ। সেই রকম রস জ্বাল দিয়ে—এই যে দেখুন—এই রকম পাটালি বানানো হয়। এগুলো ফ্রিজে রাখলে বহুদিন থাকে। খেলে বুঝবেন। আপনাদের রাইস পুডিং থেকে অনেক ভালো।'

সবাই চলে যাবার পর সাকিনার জ্বলজ্বলে মুখের দিকে তাকিয়ে রকিব বলল, 'কি, খুশী তো? স্ট্যানলি কি চমৎকার ছেলে, তাই না?'

'সত্যি, এরকম আমুদে দিল-খোলা লোক এদেশে এসে আর দেখিনি।'
'আরো দেখবে ওর কতো গুণ। বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে, এখানে লেকের ধারে বিরাট বাড়ি, অনেক সম্পত্তি। বাবা মারা গেছে মাস দুই হল, তাই ফিরে এসেছে। ওই এখন সব সম্পত্তির মালিক। বলছিল আবার বোট কিনবে।'
'ও না ডাক্তার? ডাক্তারী করে সময় পাবে বোট নিয়ে ঘুরতে?'
'আরে না-না। ও কেন ডাক্তার হবে। ওর বউ ডাক্তার। ওদের তো রিয়েল-এস্টেটের বিরাট ব্যবসা। বললাম না—বেজায় বড়লোক। স্ট্যানের হল বোট রেসের নেশা। দেখবে কেমন হুল্লোড়ে হবে এবার সামারে। তুমি আর মন খারাপ করে থাকার চান্স পাবে না। স্ট্যান একাই তোমাকে মাতিয়ে রাখবে।'

॥ দশ ॥

সাকিনা গাড়ি চালানোর পরীক্ষায় পাস করেছে। তার জন্য আজকের এই সেলিব্রেশান। পুরো প্ল্যানটাই স্ট্যানলির। আগের দিনই বলেছিল, 'তোমরা প্রথমে আমার বাড়ীতে এসে ব্রাঞ্চ করবে। তারপর সাকিনা, তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। একটা নতুন জিনিস দেখাব।'
রকিব বলে উঠেছিল, 'শুধু সাকীর জন্য সারপ্রাইজ? আমি ফেলনা?'
'না, না, সারপ্রাইজটা সকলের জন্যই। তবে সাকিনা এত তাড়াতাড়ি এক চান্সেই ড্রাইভিং পাস করে ফেলল কিনা, তাই ওর জন্য আমিও সারপ্রাইজটা এগিয়ে আনলাম।'
ব্রাঞ্চ করা সাকিনার ধাতে সয় না। শুক্র শনি রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত পার্টি হৈহল্লোড় ক'রে লোকে পরদিন এগারটা পর্যন্ত ঘুমোবে, তারপর বারোটার সময় ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ একত্রে খাবে। যত রাতেই ঘুমোক না কেন, সকালে সাকিনার ঘুম ভাঙবেই। আর ঘুম ভাঙলেই তার ক্ষিধে পাবে।
সাকিনা বেরোবার আগে ঠিকই সকালের নাশতা খেয়ে বেরিয়েছিল। ওতো এতদিনে জেনেই গেছে ঐ ব্রাঞ্চ খেতে বসতে বসতে তার দুপুরের ক্ষিদে লেগে যাবে।
স্ট্যানলিদের বাড়িটা ক্যাস লেকের ধারে। লেকটা এখানকার বাড়িগুলোর পেছন দিকে। অর্থাৎ রাস্তা থেকে লন পেরিয়ে বাড়িতে উঠে প্রথমে ড্রয়িং রুম। পেছনে লেকে যেতে হলে ঘর-বারান্দা পেরিয়ে তবে যেতে হবে। কিংবা বাড়ির পাশের গা-ঘেঁষা লন

পেরিয়ে। পেছনে খানিকটা উঠোন, তারপরই লেক। লেকের ধারে অগভীর পানির ওপর কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো একটা আট দশ ফুট লম্বা পাটাতন—এরা বলে 'ডক'—ডকের শেষ প্রান্তে বাঁধা একটা ঝকঝকে নতুন বোট।—এটাই স্ট্যানলির সারপ্রাইজ। নতুন বোট কিনে ফেলেছে।

এ বাড়ির ড্রয়িং রুম ডাইনিং রুম আলাদা। ঘরের সিলিং বেশ উঁচু—পুরনো ধাঁচের বাড়ি কিন্ত পুরনো নয়। স্ট্যানলির বাবার আমলেই তৈরি। আমেরিকানদের একটা নেশা আছে এ্যান্টিক বাড়ি-গাড়ি আসবাবের প্রতি। তৈরি না পেলে নতুন বাড়িই বানাবে দু'তিনশো বছরের পুরানো স্টাইলে।

বসার ঘরের, খাবার ঘরের আসবাবপত্র এ্যান্টিক ডিজাইনের। ডাইনিং টেবিলের ওপর ঝাড়বাতি ঝুলছে সিলিং থেকে। ইউনিফর্ম পরা 'মেইড' এসে ব্রাঞ্চ সার্ভ করল ওদের। ধোঁয়া ওঠা গরম প্যানকেক, মেইপল সিরাপ, পানিপোচ করা মোলায়েম ডিম, পোচটাও এত সুন্দর হয়েছে, হলদে কুসুমের চারপাশের সাদা অংশটা একেবারে চুড়ির মত গোলাকার—সাকিনা অবাক হল, এত গোল হল কি করে।

সারা আমেরিকা জুড়ে শনি রোববার সকালের ব্রাঞ্চের মেনু হল এই—প্যানকেক আর মেইপল সিরাপ। এর সঙ্গে, ডিম, সসেজ, স্ট্রবেরী—যার যা পছন্দ।

খাওয়ার পরে স্ট্যানলি নিয়ে গেল তার সারপ্রাইজ দেখাতে। নতুন বোট দেখে সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। রকিব একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বোটের ওপর। সাকিনা ডকের উপর দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখতে লাগল—কি সুন্দর বোট। এ রকম বোট সে আগে দেখেনি। বোটটার বাইরের চেহারা অন্যসব বোটের মতই, কিন্তু ভেতরে মোটরগাড়ির সীটের মত গদীআঁটা সীট। ড্রাইভারের সীটের সামনে মোটরের মতই স্টিয়ারিং—আরো কি কি সব চকচকে জিনিসপত্র—নিশ্চয় বোটের উপযোগী ক্লাচ, ব্রেক, এ্যাকসিলারেটার হবে। বোটের পেছনের সরু জায়টাতে ইঞ্জিন। অন্যসব বোটের মতই এই বোটের মাথাতেও কোন ছাউনি নেই। বোটের গায়ে স্টেইনলেস স্টীলের অক্ষর দিয়ে লেখা আছে—বার্কলে ঃ জেট-ড্রাইভ।

স্ট্যানলি বোঝাল, ইঞ্জিনটা জেট-পাওয়ার্ড—খুব স্পীডে চলতে পারে। বোটের পেছনে লাগানো একটা হুক দেখিয়ে বলল, 'এইটেয় শেকল বেঁধে ওয়াটার-স্কী করা যায়। আজ রকিব বোট চালাবে, আমি ওয়াটার স্কী করব। তোমরা আজ বসে বসে দেখ। সাকিনা তোমাকে ওয়াটার-স্কী শিখিয়ে দেব। দেখবে, কি মজা লাগে।'

সাকিনা আঁতকে উঠে বলল, 'ওরে বাবা। ও আমি জীবনেও পারবো না। আমি দেশে 'হাওয়াই-ফাইভ-ও' সিনেমায় দেখেছি। ভয়ানক রিস্কি ব্যাপার।'

স্ট্যানলি হা হা হাসির শব্দে চারপাশ চমকে বলল, 'মোটেই রিস্কি না। একবার শিখে নিলে দেখবে কি রকম থ্রিলিং। তাই না রকিব?'

রকিব গাল চুলকে বলল, 'হ্যাঁ থ্রিলিং বটে, তবে ঐ পর্যায়ে যাবার আগে শেখার সময়টা বড়ই কষ্টের। রিস্কিও বটে।'

মিরাণ্ডা মুচকি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, কতোবার যে ডিগবাজী খেয়েছ, তার আর লেখাজোখা নেই।'

সাকিনা হঠাৎ সজাগ হয়ে বলল, 'কখনকার কথা বলছ? কখন কোথায় ও স্কী শিখত? তুমি ছিলে সে সময়?'

রকিব বোট থেকে লাফ দিয়ে ডকে এসে বলল, 'বারে, স্ট্যানের বোট ছিল না আগে? ও আর মিরান্ডা তো এখানেই ছিল ক্যানিফোর্নিয়া যাবার আগে। স্ট্যানের বোটেই তো আমি ওয়াটার-স্কী শিখেছি। উঃ কি মজাতেই কেটেছে সে দিনগুলো। হঠাৎ বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে স্ট্যান স্যানডিয়েগো চলে গেল বলেই না সবকিছুতে ছেদ পড়ে গেল।'

স্ট্যানলি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, চল, চল, সবাই বোটে ওঠো। আমরা অন্ততঃ একচক্কর দিয়ে আসি লেকের ওপর। এখনো কেউ চড়িনি নতুন বোটে। সাকিনা, তুমি আগে ওঠো বোটে। তোমার এত তাড়াতাড়ি গাড়ি চালানো শেখার পুরস্কার এই বোটরাইড।

বিকেল পর্যন্ত লেকের ওপরেই কেটেছে। স্ট্যানলি আর রকিব পালা করে বোট চালিয়েছে আর স্কী করেছে। সাকিনা মিরান্ডা পেছনের সীটে বসে দেখেছে আর গল্প করেছে। মিরান্ডাও স্কী করতে পারে কিন্তু স্ট্যানলি রকিবের অনেক সাধা-সাধিতেও আজ রাজী হয়নি।

এখন সন্ধ্যা ছটার সময় ওরা যাচ্ছে ডিনার খেতে—একটা মেক্সিকান রেস্তোরাঁতে। জুন মাসের ঝকঝকে সন্ধ্যা, রোদে চার দিক ভেসে যাচ্ছে। সূর্য ডুববে রাত নটার পরে। সাকিনা হঠাৎ বলে উঠল, 'স্ট্যানলি তোমাদের কি অদ্ভুত অভ্যেস। সন্ধ্যে ৬টা-৭টার মধ্যে ডিনার খাওয়া চাই-ই। তারপর শুতে যাবার আগ পর্যন্ত তোমরা কতোবার যে কাজু বাদাম, আইসক্রীম, স্ট্রবেরী, কুকিজ খাও, তার হিসেব নেই। কেন সন্ধ্যে থেকে ঐসব খেয়ে রাত নটার দিকে ডিনার খেতে পার না?'

স্ট্যানলি হেসে বলল সারা দেশ জুড়ে সবার এই অভ্যেস গড়ে উঠেছে

কতো বছর ধরে। এখন আর বদলানো সম্ভব নয়। কি জানো—আমরা এখানে সবাই খুব খাটি তো, সকাল আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। দুপুরে দু-একটা হাল্কা স্যান্ডুইচ খাই। তাই কাজ থেকে বাড়ি ফিরেই রাক্ষসের মত খিদে পায়। তাই সব ফেলে আগে পেট পূজো করে নেই। পেট ঠান্ডা হলে সব ঠান্ডা। তারপর গান শোনো, টিভি দেখ, বেড়াতে যাও—যা খুশী কর। কতো সুবিধে।

সাকিনা হেসে ফেলল, 'সব বিষয়েই জবাব তোমার ঠোঁটের আগায়, তাই না স্ট্যানলি ?'

স্বল্পভাষিনী মিরান্ডা মুচকি হেসে বলল, 'সর্ব বিদ্যা বিশারদ !'

'বেশতো তাহলে তুমি গাছও নিশ্চয় চেন। বলতো—ঐ যে পথের পাশের ঐ গাছটা, ওটার নাম কি ?'

কথা শেষ হবার আগে গাড়ির গতিতে গাছ পেরিয়ে গেছে। স্ট্যানলি বলল, 'গাছ তো দেখতে পেলাম না। কি করে বলব ?

রকিব বলল, 'সাকীর গাছ চেনার খুব ঝোঁক হয়েছে কয়েক মাস থেকে। সবাইকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে কোনটা কি গাছ নাম বলার জন্য।'

সাকিনা ঠোঁট উল্টে বলল, 'দোষের কি হল ? এদেশে তো দেখি—সবাই একটা না একটা হবি নিয়ে আছে। স্ট্যানলি তোমার বোটের নেশা। আমার পড়শী ফ্রিডার হবি পাখি দেখা। আমার না হয় গাছ চেনার হল। তোমাদের আপত্তি আছে ?'

'মোটেই না' স্ট্যানলি বলল, 'কি কি গাছ চিনেছ এ পর্যন্ত ?'

'মেইপল'—সাকিনার কথা কেটে রকিব বলে উঠল, 'ওতো আমাদের বাসার সামনেই আছে—'

সাকিনা বিদ্রূপ করে বলল, 'থাকলে কি হবে ? তুমি তো নাম বলতে পারনি। ফ্রিডা বলে দিয়েছে। তুমি এতদিন এদেশে আছ, একটা গাছও চেন না।'

মিরান্ডা টিপ্পনী কাটল, 'চিনবে কি করে ? ওর নজর কি কোন কালে গাছের দিকে ছিল ?'

স্ট্যানলি চেঁচিয়ে উঠল, 'সাকিনা আর কি কি গাছ চিনেছ ?'

'মেইপ্‌ল্, এলম্, বার্চ, ফার স্প্রুস। পাইন তো আগে থেকেই চিনি—'

'আগে থেকে কি করে চিনলে ?'

'কেন ইংরেজি বইয়ে দেখে। কিন্তু মজা কি জানো ? যে ওক গাছের নাম এত বিখ্যাত, সেই ওক গাছই কেউ আমাকে দেখাতে পারল না আজ পর্যন্ত।

'কটা লোককে জিজ্ঞেস করেছ এ পর্যন্ত ?'

সাকিনা স্বীকার করল রকিব ছাড়া আর কাউকে বিশেষ জিজ্ঞেস করা হয়নি। স্ট্যানলি হাসল, 'তাহলেই দেখ তোমার জ্ঞান অর্জন পদ্ধতিতে গলদ আছে। এখন থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, স-ব গাছ চিনিয়ে দেব।'

গাড়ি যাচ্ছিল লোন পাইন রোড ধরে। রাস্তার পাশে খানিক দূরে দূরে সাইনবোর্ডে রাস্তার নাম লেখা। এরকম একটা সাইনবোর্ড পার হবার পর সাকিনা বলল, 'কি অদ্ভুত নাম! লোন পাইন রোড। মানে, নিঃসঙ্গ একাকী একটি পাইন গাছের রাস্তা। নামটার মধ্যে বেশ একটা উদাস বিষাদের ভাব আছে, তাই না? আচ্ছা রাস্তার নাম এরকম রাখা হল কেন? রহস্যটা কি? যে রেখেছিল সে কি কবিতা লিখত?'

স্ট্যানলি গম্ভীর মুখ করে বলল 'কি জানি। দেখা হলে জিজ্ঞেস করব। তবে আমার কি মনে হয় জান? পাইন গাছ সাধারণতঃ পাহাড়ী এলাকায় এক জায়গায় অনেকগুলো এক সঙ্গে জন্মায়। মনে হয় কেউ কোন পাহাড় থেকে একটা পাইন চারা তুলে এনে এই রাস্তার ধারে লাগিয়েছিল। সেই নিঃসঙ্গ, একাকী গাছটার জন্যই হয়ত এ রাস্তাটার এই নাম হয়েছে।'

'তা হতে পারে। রাস্তাটা তো খুব লম্বা, কোন জায়গায় সেই গাছটা—জানো কি?'

'না এদিকে বিশেষ পাইন গাছ দেখা যায় না।'

'সত্যি আমিও লক্ষ্য করেছি, পাইন গাছ একটু যেন কমই এ অঞ্চলে। স্প্রুস আর ফার গাছই বেশী। ঐতো—ঐতো—আরে ঐতো একটা পাইন গাছ! ইঃ! পার হয়ে এলাম।'

রকিব মৃদু ভৎর্সনার স্বরে বলল, 'সাকী তুমি যা চেঁচামেচি করছ স্ট্যানলি না গাড়ি একসিডেন্ট করে বসে।'

'আরে না, না, আমার অত কাঁচা হাত নয়। সাকিনা যে এনজয় করছে, এতেই আমি কৃতার্থ। কি চমৎকার কাটল সারাটা দিন, দেখত! এই দেখ রেস্তরাঁয় পৌঁছে গেছি। চল খেয়ে নি। পেট ঠাণ্ডা করে তারপর না হয় ওক গাছের সঙ্গে দেখা করতে বেরোব।

স্ট্যানলি গাড়ি পার্ক করল টাকোস বেল রেস্তরাঁর সামনে। নামতে নামতে সাকিনা বলল, 'আজ আর নয়। খেয়েই সোজা বাড়ি। খুব ক্লান্ত লাগছে।'

স্ট্যানলি অবাক স্বরে বলল 'কি কাণ্ড! স্কী করলাম আমরা আর বসে বসে ক্লান্ত হলে তুমি! আজব কথা শুনছি!'

।। এগার ।।

মিশিগানে আবহাওয়ার মতিগতির হদিস পাওয়া মুশকিল। গত কদিন গেল মেঘ আর বৃষ্টি। এদেশে সামারে বৃষ্টি অনাসৃষ্টি ব্যাপার। তবু তাও ঘটল। আজ আবার চারদিক ভাসিয়ে রোদ উঠেছে।

সাকিনা সামনের দরজা খুলে এক চিলতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার মনটা খুব ভার। রকিবের সঙ্গে সম্পর্ক কদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। তুচ্ছ কারণে কথা কাটাকাটি রাগারাগি। তার জের হিসেবেই কিনা কে জানে—পরপর তিনদিন তিনরাত অন্‌কল্‌ ডিউটি করছে হাসপাতালে।

দুপাশের দুতিনটি বাড়ির কয়েকজন তরুণী গৃহিণী তাদের লনের সবুজ ঘাসে নাইলনের ফিতেয় বোনা লম্বা লাউঞ্জ চেয়ার পেতে তাতে টান টান হয়ে শুয়ে সান বেদিং করছে। ফ্যাকাসে সাদা গায়ের চামড়া রৌদ্রে মেলে রেখে সেটাকে বাদামী ট্যান করার হুজুগ এদেশের মেয়েদের মধ্যে প্রচণ্ড। এক নজর তাকিয়ে সাকিনা চোখ ফিরিয়ে নিল। এ দৃশ্য এদেশে সামারে যত্রতত্র। তবু এখনো দেখলে সাকিনার লজ্জা লাগে। এরা যে বিকিনিটা পরে রৌদ্র স্নান করে, এরকম স্টাইলের বিকিনি সে আগে কোন ইংরেজী ম্যাগাজিন বা সিনেমায় দেখেনি। বুকে দু টুকরো ছোট্ট তিনকোনা কাপড় ফিতে দিয়ে আটকানো। নাভিরও অনেক নিচে উরুসন্ধির ওপর এক টুকরো তিনকোণা কাপড় সরু ফিতে দিয়ে আটকানো। ফ্রিডাকে জিজ্ঞেস করেছিল বিকিনির এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দৈন্য-দশা কবে থেকে হয়েছে। ফ্রিডা হেসে বলেছিল, বছর পাঁচেক থেকে। সাকিনা বলেছিল, কমতে কমতে একদিন নেই হয়ে যাবে না তো?

ফ্রিডার কথা মনে হতেই ভাবল, যাই, খালাম্মার খোঁজ নিয়ে আসি।

ফ্রিডার শাশুড়ী জাহানারা ইমাম এসেছেন বেশ কয়েক মাস হল। মহিলার মুখের ভেতর ক্যানসার হয়েছে। প্রথম কয়েক মাস কিমো-থেরাপী দেওয়া হয়েছে। তিন চারদিন আগে হাসপাতালে গেছেন অপারেশানের জন্য।

উনি আসার পর সাকিনার নিঃসঙ্গতা অনেকখানি ঘুচে গেছে। সোম থেকে শুক্রবার এ বাড়িতে সাকিনা একা, ও বাড়িতে উনি একা। কারণ সাইফ, ফ্রিডা দুজনেই চাকরি করে। ফলে দুই অসম-বয়সী মহিলার মধ্যে একটি চমৎকার সখ্যতা গড়ে উঠেছে। জাহানারা ইমামের সঙ্গে তাঁর পুত্র বধূরও খুব সখ্যতা। তার জন্য সাকিনা ফ্রিডারও মনের খুব

কাছাকাছি চলে গেছে।
ফ্রিডা পেছনের বাগানে কাজ করছিল। বাগান মানে ছয় ফুট বাই দশ ফুট এক টুকরো জমি—প্রত্যেক বাসার পেছনেই এই একই সাইজের বাগান। —সামনের ঘাসে ঢাকা লনে কোন গাছ লাগানোর নিয়ম নেই। ফুল গাছ যা লাগানোর এই পেছনের বাগানেই লাগানো চলে। কমবেশী সবাই এই বাগানটুকুতে নানারকম মৌসুমী ফুলের গাছ লাগায়। শীতের বরফ গলে গেলে দেখা যায় সব বাড়ির গৃহিনীই খুরপী নিড়ানি হাতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। দেখাদেখি সাকিনাও দোকান থেকে কিছু গাছ এনে তার বাগানে লাগিয়েছে। এখানে বাগান করার খুব সুবিধে। দোকানে একেবারে ফুটন্ত ফুল সহ ছোট ছোট গাছ পাওয়া যায় টবে, সেগুলো কিনে এনে লাগিয়ে দিলেই হল। মাঝে মাঝে একটু মাটি খোঁড়াখুড়ি, পাইপে করে পানি দেয়া—বাস, বাগান আলো করে ফুল ফুটে থাকে।
বাগানের ছয় ফুট দশ ফুটের মধ্যে পেছনের দরজার সিঁড়ির কাছে চার ফুট বাই চার ফুট জায়গাটা আবার পাকা, সেখানে চারটে ছোট সাইজের প্লাস্টিকের লন-চেয়ার পাতা। সাকিনা এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ফ্রিডা চোখ তুলে দেখে হাই বলে সম্ভাষণ করে খুরপী চালাতেই থাকল। সাকিনা বলল, 'তোমার শাশুড়ি কেমন আছেন?'
'ক্রমেই ভালোর দিকে। গতকাল প্লাস্টিকের সিরিঞ্জে করে ফলের রস মুখের ভিতর নিয়ে গিলতে পেরেছেন।'
ফ্রিডার পাশের বাসার রোজও দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ফ্রিডাকে তার শাশুড়ীর খবর জিজ্ঞেস করলেন। রোজের বয়স পঞ্চান্ন ষাট হবে, বেশ লম্বা চওড়া শরীর, এই বয়সেও খুব সুন্দরী। আর ভারী হাসিখুশী, খুব কথা বলেন। পাড়ার সব্বার ভালো মন্দের খোঁজখবর করেন। সাকিনাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, 'এই যে মেয়ে কেমন আছ? তোমার স্বামীর রেসিডেন্সি শেষ হল? বোর্ড পরীক্ষা কবে?'
'সেপ্টেম্বরে। ও ভীষণ ভয় পাচ্ছে এ পরীক্ষা নিয়ে।'
'হ্যাঁ পরীক্ষাটা খুব কঠিন। এটায় পাশ করলে তবেই তো ডাক্তারি প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স পাবে।'
একটু পরে রোজ ভেতরে চলে গেলেন। সাকিনা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'রকিব ভাবছে ও ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা দেবে। ও লাইসেন্স পেলে আমরা ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাব।'
ফ্রিডা হাতের খুরপী ফেলে সোজা দাঁড়িয়ে গেল, 'সে কি? মিশিগানের কি দোষ পেলে? এখানে ভাল লাগছে না?'
সাকিনা কুন্ঠিত স্বরে বলল, 'না না মিশিগানের কোন দোষ নয়।

এখানকার শীতকালটা কেন জানি আমার সহ্য হচ্ছে না। ক্যালি-ফোর্নিয়ায় বরফ পড়ে না –'

'কটা শীত তুমি মিশিগানে কাটালে? মাত্র একটাই তো। দু একটা শীতের পরই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বরফ পড়ে না সত্যি, তবে সেখানে মিশিগানের মত এমন চারটে চার রকম স্পষ্ট ঋতুও নেই। সারা বছর একঘেয়ে আবহাওয়া ওখানে। আর জীবন যাত্রার খরচ খুব বেশী। দু একটা বছর কাটলে দেখবে মিশিগানের মত সুন্দর স্টেট খুব কমই আছে। শীত বরফেরও একটা সৌন্দর্য আছে। তাছাড়া স্প্রিং, সামার, ফল তিনটে ঋতুরই আলাদা আলাদা চেহারা। কতো বৈচিত্র্য এখানে!'

সাকিনা চুপ করে শুনল। সত্যিই কি তার শীতকালে কষ্টের কথা ভেবে রকিব ক্যালিফোর্নিয়া যাবার কথা ভাবছে? কই সে তো একবারও বলেনি এখানকার শীতে সে থাকতে পারবে না। শীতে যখন কষ্ট হয়েছিল, তখন তো রকিব একবারও বলেনি, বরফ নেই এমন স্টেটে যাবার চেষ্টা করবে? এখন সে যখন সামারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে, গাড়ি চালানো শিখেছে, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি খোঁজা হচ্ছে, তার কোন একটা চাকরি নেবার বিষয় ভাবা হচ্ছে—তখনই রকিব বলা শুরু করেছে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে বোর্ড পরীক্ষা দেবার কথা। সাকিনার এই বরফ সহ্য হয় না, একথা সাকিনা বলেনি, রকিবই বলতে শুরু করেছে।

'কি ভাবছ?' ফ্রিডার প্রশ্নে সাকিনা সম্বিত পেয়ে লাজুক হাসি হাসল, 'না তোমার কথার যুক্তিই ভাবছিলাম।'

'ঠিক বলেছি কি না? এই স্টেটে ফল সীজনের যেমন বাহার ক্যালি-ফোর্নিয়ায় তা পাবে না।'

'ফ্রিডা তুমি মিশিগান খুব ভাল বাস, তাই না?'

'নিশ্চয়। এখানেই আমার জন্ম, এখানকার স্কুলে পড়েছি, এখানে বেড়ে উঠেছি, বাবা মা ভাই বোন এখানে আছে—'

'তাই। আমার তো জন্ম, বেড়ে ওঠা, লেখা পড়া বাবা মা ভাই বোন সব অন্য দেশে। আমার কাছে মিশিগানই বা কি, ক্যালিফোর্নিয়াই বা কি?'

ফ্রিডা হঠাৎ যেন হোঁচট খেল মনের মধ্যে। তা বটে। তারপর সাকিনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে থেকে কোমল স্বরে বলল, 'সাকিনা মন যেন ভাল নেই মনে হচ্ছে?'

হঠাৎ সাকিনার দুই চোখ উপচে পানি চলে এল। ফ্রিডা এগিয়ে এসে সাকিনার হাত ধরে 'এস ঘরে এস' বলে ওকে উঠিয়ে দরজা খুলে বাসার ভেতরে ঢুকল। সাকিনা জিজ্ঞেস করল 'জামী ভাই কোথায়?'

'ও গেছে হাসপাতালে, ওর মার কাছে। বিকেলের আগে ফিরবে না।'
সাকিনা খানিকক্ষণ থম ধরে বসে রইল তারপর হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। ফ্রিডা খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে তাকে কাঁদতে দিল। সাকিনা একটু সুস্থির হলে খুব নম্র গলায় বলল 'যদি ইচ্ছে কর, আমাকে সব বলে একটু হালকা হতে পার।'
সাকিনা চোখ মুছে বলল, 'কি বলব, বুঝতে পারছি না। বলার মত কিছুতো নেই। অথচ আমার খুব খারাপ লাগে। খুব একা লাগে, অসহায় লাগে। মনে হচ্ছে রকিব খুব বদলে যাচ্ছে। যদি জিজ্ঞেস কর, কিসে বুঝলে, তাহলে বলতে পারব না। ওকে আজকাল খুব অচেনা লাগে। মনে হয়, যে লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, এ সে লোক নয়। মাঝে মাঝে কি যে হয় ওর দু তিন দিন আমার সঙ্গে কথা কয় না, আমাকে ছোঁয় না। তারপর আবার খুব আদর করে এত বেশী বেশী করে যে আমার ভয় ধরে যায়। মাঝে মাঝে খুব খারাপ ব্যবহার করে, আমার আত্মীয় স্বজন নিয়ে খারাপ কথা বলে। আমি বুঝি না, বুঝি না ওকে।' বলতে বলতে আবার কান্নায় ভেংগে পড়ল সাকিনা। ফ্রিডা নীরবে ওর হাত ধরে বসে রইল। খানিকক্ষণ পরে সাকিনা নিজেকে সামলে চোখ মুছে বলল, 'তোমাকে বোধহয় বিরক্ত করলাম —'
'না, না, মোটেই না, আমিই তো তোমাকে বলতে বললাম—'
'তোমাকে কেন জানি আমার খুব আপন মনে হয়। মায়ের পেটের বোনের মত মনে হয়।'
'তাই ভেবো আমাকে। যখনি মন খারাপ করবে, আমাকে বলবে। যখনি কোন দরকার হবে, আমাকে ডাকবে। একটুও সংকোচ করবে না। ঠিকতো?'
'ঠিক।'
'এসো, একটু আইসক্রীম খাও। স্ট্রবেরী আছে খাবে?'
'খাবো।'
খেতে খেতে সাকিনা বলল, আরো 'একটা ব্যাপারে আমার খুব খটকা লাগে। এখানে বাঙালী কম নেই, ঈদের সময় মসজিদে গেলে দেখি। তাদের কারো কারো সঙ্গে ওর আগে থেকে পরিচয়ও আছে। অথচ কোন সময় তাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে না বা তাদেরকে কখনো আমাদের বাসায় আসতে বলবে না। তোমরা না থাকলে আমি বোধহয় দমবন্ধ হয়ে মারা যেতাম।'
ফ্রিডা শুধু বলল, 'রকিবের সঙ্গে আগে আমাদের পরিচয় হয়নি। তাই বুঝতে পারছি না কেন এরকম করছে ও। বোধ হয় বোর্ড পরীক্ষার

দুশ্চিন্তায়। তুমি জানো না, কি রকম কঠিন এই পরীক্ষা। আমার ভাই তো ডাক্তারী পাশ করে রেসিডেন্সি পেতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রকিব তবু তো তিন বছরের রেসিডেন্সি ভালোভাবে শেষ করেছে। অত ভেবোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আসলে এ জায়গাটার প্রতি আমার একটা মায়া পড়ে গেছে। রকিব ক্যালিফোর্নিয়া যেতে চাওয়াতে আমিও বোধহয় অচেনা জায়গা বলে ভয় খেয়ে গেছি। তাই বোধ হয় এমন পাগলের মত করলাম।'

ফ্রিডা শুধু হাসল। সাকিনাও তার দিকে চেয়ে হাসল। এতক্ষণে তার মন হালকা হয়ে গেছে। আর ভয় লাগছে না, অসহায়ও লাগছে না। এই তো তার এক বোন রয়েছে—বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। খালাম্মা আছেন, যদিও তিনি অসুস্থ, তবু তাকে মায়ের মত মনে হয়।

সাকিনা মনে মনে স্থির করে ফেলল, সে রকিবকে কিছুতেই ক্যালিফোর্নিয়ায় যেতে দেবে না। এখানেই বোর্ড পরীক্ষা দিতে বলবে। এখানেই থাকতে চায় সাকিনা।

'ফ্রিডাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি খালাম্মাকে আজ দেখতে যাবে না?'

'যাব, সাইফ ফিরে এলে আমি যাব।'

'আমাকে নেবে তোমার সঙ্গে?'

'নিশ্চয়। যাবার আগে তোমাকে ডেকে নেব।'

॥ ১২ ॥

সাকিনা উদাস চোখ মেলে সামনের চিলতে বারান্দায় বসে ছিল। রাস্তার ওপারে বিরাট খেলার মাঠটায় পাঁচ-ছটা ফুটবল খেলোয়াড়ের দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলছে। কোন কোন দল পাঁচ ছ' বছরের ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়া, কোন দল দশ বারো বছরের ছেলেমেয়ে নিয়ে। এত বিরাট মাঠ—পাঁচ ছটা দল আলাদা আলাদা চৌহদ্দি বানিয়ে খেলছে, তবু মাঠটা ভরেনি। প্রত্যেকটি দলের চৌহদ্দি ঘিরে অনেক বয়স্ক নারীপুরুষ। বোঝা যায় ঐ দলের খেলেয়াড়দের বাবা মা। খেলোয়ারদের চেয়ে তাদের বাবা মারাই চেঁচাচ্ছেন বেশী। ফ্রিডাদের সদর দরজা খুলে জাহানারা ইমাম বেরিয়ে এলেন। মহিলার গায়ে কার্ডিগ্যান। দেখে সাকিনা হেসে ফেলল। আমেরিকানদের জন্য আবহাওয়া বেশ উষ্ণই। বেশীর ভাগ লোকই পাতলা সুতি কাপড়—হাফ প্যান্ট, হাতকাটা জামা—এসব পরে ঘুরছে। আজো সাকিনার ডানপাশের দুটো বাসার সামনে দুজন তরুণী রৌদ্রস্নান করছে। সাকিনা নেমে ফুটপাথে এসে জাহানারা

ইমামের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'খালাম্মার শীতটা একটু বেশী।'
'আর বোলনা মা। এই ছাইয়ের দেশের আবহাওয়াটা আজ পর্যন্ত রপ্ত হল না। ঢাকার আগস্ট মাসের কথা ভেবে দেখ দিকি? কি প্যাচপেচে গরম। ফুলস্পীডে পাখা চালিয়ে কুল পাই না, আর এখানে এই জ্বলজ্বলে রোদে কার্ডিগ্যান পরে হাঁটছি, কেউ বিশ্বাস করবে?'
'আপনি অসুস্থ মানুষ, আপনার শীত বেশী লাগারই কথা। আমারও প্রথম বছর খুব শীত লেগেছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছে। খালাম্মা আপনার মাথায় নতুন চুল গজাচ্ছে মনে হচ্ছে? গোটা মাথা কালো কালো ফুটকিতে ভরে গেছে।'
'হ্যাঁ। ডাক্তার বলেছিলো না, কিমোথেরাপী বন্ধ করার এক মাস পর থেকে চুল গজাবে?'—মাথায় একবার হাত বুলিয়ে 'বেশ লাগে হাত বুলোতে। কদম ফুলের মত।' বলতে বলতে খালাম্মা হেসে ফেললেন। তারপর সাকিনার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মোলায়েম গলায় বললেন, 'তোমাকে একটু যেন শুকনো শুকনো লাগছে। চোখের নীচে কালি। শরীর ভালো আছে ত?'
সাকিনা ঠোঁট টিপে মাটির দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ নীরবে হাঁটল। বুকের ভেতর ঠেলে ওঠা কিছু একটা দমন করল, তারপর বলল, 'শরীর ভালই আছে। তবে খালাম্মা রকিব নেই তো, রাতে ভয় লাগে। একা বাড়িতে আগে কখনো থাকিনি, কতো কি যে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হয় বাড়ির মধ্যে, বারে বারে ঘুম ভেঙ্গে যায়, খালি মনে হয় বুঝিবা চোর ঢুকছে। তখন বাতি জ্বেলে সব ঘর দেখি। আবার কোন সময় ভয়ে ঘর থেকে বেরোই না। বাতি জ্বেলে বিছানায় বসে থাকি। তারপর শুলেও ঘুম আসে না সহজে।'
জাহানারা হাসলেন, 'এটা আগে আমারও হত। জামী, ফ্রিডা পাশের ঘরে শুয়ে, তাও ক্যাঁচকোঁচ শব্দে মনে হত চোর ঢুকছে বুঝিবা। আসলে এদেশে সব বাড়ির দেয়ালের ভেতরটা ফাঁপ তো, হিটিংয়ের পাইপ যাবার জন্য, তাই নানা রকম শব্দ হয়। হিটিং বা এয়ারকণ্ডিশনার চালু থাকলে তো শব্দ আরো বেশী হয়। তাছাড়া দেখনা, এই কণ্ডোমিনিয়ামগুলো নটা করে বাড়ি গায়ে গায়ে লাগানো। পাশের বাড়ির বাথরুমে কল ছাড়লো তো তোমার বেড রুমে শুয়ে মনে হবে নীচে কেউ বুঝিবা পা টিপে হাঁটছে। আমি তো জামীদের এই বাড়িতে আরো দুবার এসে থেকেছি, দুবারই ভয় খেয়েছি। এবার ঠিক হয়ে গেছে। আগে তো দিনের বেলা দরজার ছিটকিনি খোলা রেখে বসার ঘরেও বসতে সাহস পেতাম না, মনে হত কেউ বুঝি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরবে! এখন আর সেরকম ভয় করে না। আসলে এখানে ছিচকে চোর নেই

বললেই চলে।'
'কেন খালাম্মা, ডেট্রয়েটে তো শুনি—'
'ডেট্রয়েট. শিকাগো, নিউইয়র্ক—ওসব বড় বড় শহরে চুরি, চামারি, খুন রাহাজানি হয়। কিন্তু এই সব পাড়া গাঁয়ের মত শহরতলী এলাকায় ছোট খাট চুরি চামারি হয়ই না বলা চলে। তবে বাংলাদেশ থেকে এসে প্রথম প্রথম ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। আমি তো এতদিনে একটুখানি কম ভয় পাই।' বলে জাহানারা সকৌতুকে হাসলেন। 'অনেকক্ষণ হেঁটেছি। এবার যাই, বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নেই।'
সাকিনা অবাক হয়ে বলল, 'ওমা মোটে তো দেড় পাক ঘুরলেন।'
'আমার দেড় পাকই তোমাদের দশ পাক।' বলে জাহানারা বাড়ির দিকে চলে গেলেন। সাকিনা আরো খানিকক্ষণ একা একা হেঁটে তারপর বাসায় ঢুকে গেল। ঢুকতে ঢুকতেই শুনল ফোন বাজছে। বুকটা ধ্বক করে উঠল, রকিব নিশ্চয়। দৌড়ে ফোন ধরতেই স্ট্যানলির গলা ভেসে এল, 'হাই সাকিনা। কেমন আছ, খবর নেবার জন্য ফোন করলাম।'
সাকিনার গলায় নৈরাশ্য চাপা থাকলো না, 'ও—তুমি!'
'তুমি বুঝি ভেবেছিলে রকিব?'
সাকিনা চুপ। দৌড়ে এসে ফোন ধরার জন্য একটু একটু হাঁপাচ্ছে।
'তাই না সাকিনা? তাই না? তুমি নিরাশ হয়েছ। ঠিক কি না।'
'স্ট্যানলি তুমি কি থটরিডিং জান? সত্যি ভেবেছিলাম রকিবের ফোন বুঝি। কিন্তু তোমার গলা শুনেও ভাল লাগছে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—নেই মামার চেয়ে কাঁনা মামা ভালো।'
'হাঃ হাঃ হাঃ, তোমার রসবোধ অতি উচ্চস্তরের। তোমার আরেকটা গুণ আমি খুব পছন্দ করি, সেটা হল তুমি যদিও মিথ্যে বলতে পার না, তুমি অপ্রিয় সত্য খুব মিষ্টি করে বলতে জান।'
সাকিনাও হাসল, ধন্যবাদ দিল। স্ট্যানলি জিজ্ঞেস করল, 'ব্যস্ত আছ, নাকি?'
'না, কেন?'
'একটু আসতে পারি?'
'নিশ্চয়। চলে এস। ভালই কাটবে সময়টা।'
স্ট্যানলিকে একা দেখে সাকিনা অবাক হল, 'একা যে! মিরাণ্ডা কই?'
স্ট্যানলি শুকনো হেসে বলল, 'মিরাণ্ডা আসবে, তাতো বলিনি।'
'বলনি, তবে ধরে নিয়েছিলাম। একা আসবে, তাও বলনি। এসো ঘরে এসে বসো।'
সোফায় বসে স্ট্যানলি চুপ করে রইল, যেটা একেবারেই তার স্বভাব-

বিরুদ্ধ। অস্বস্তি কাটাবার জন্য সাকিনা বলল, 'চা খাবে, না কফি?'
'কফিই দাও। ব্ল্যাক। খাবার আছে কিছু? দুপুরে লাঞ্চ খাইনি।'
সাকিনা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'এক্ষুণি স্যান্ডুইচ বানিয়ে দিচ্ছি। চীজ, না বেলোনী?'
'বেলোনী।' বলে স্ট্যানলি সোফার পিঠে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করল।
কয়েক মিনিট পরে স্যান্ডুইচ আর কফি এনে সাকিনা সোফার সামনের টিপয়ে রাখল। সেই শব্দে চোখ খুলে স্ট্যানলি সামনে ঝুঁকে খাওয়ায় খুব মগ্ন হয়ে গেল।
সাকিনা খুব মনোযোগ দিয়ে স্ট্যানলিকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, 'তোমার কিছু একটা হয়েছে স্ট্যানলি। তোমাকে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে।'
স্ট্যানলি হঠাৎ গড় গড় করে বলে উঠল, 'মিরাণ্ডা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে!'
খবরটা এতই আকস্মিক যে সাকিনা হঠাৎ যেন জমাট বেঁধে গেল। কোন কথা বেরোল না মুখ দিয়ে, দুই চোখে বাসা বাঁধল ভয় আর উদ্বেগ।
কথাটা বলেই স্ট্যানলি আবার খাওয়ায় মনোযোগ দিয়েছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অস্ফুটে সাকিনা প্রশ্ন করল, 'কোথায় গেছে?'
'স্যানডিয়েগো।'
কথাটা যেন তীরের মত এসে বিঁধল সাকিনার বুকে। সে হাঁটুতে মাথা গুঁজে ফেলল। স্ট্যানলি উঠে এসে সাকিনার দুই কাঁধে হাত রেখে দুঃখিত গলায় বলল, 'আমি শেষ রক্ষা করার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, পারলাম না।'
সাকিনা মাথা তুলে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'তুমি প্রথম থেকে সব জানতে?'
'জানতাম মানে? আমিও তো এই নাটকের একটি চরিত্র। রকিব মিরাণ্ডাকে বিয়ে করার অনুমতি চেয়ে ওর মাকে চিঠি দেয়। জবাবে ওর মা নিজেই এসে যান এখানে। অনেক রাগারাগি, কান্নাকাটি, উপোষ—এসব করে ওর মা ওকে নিবৃত্ত করেন। আমি যেহেতু রকিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু উনি আমাকেও অনুরোধ করেন রকিবকে বোঝানোর জন্য। তারপর বেশ কয়েক মাস এদেশে থেকে রকিবকে সঙ্গে নিয়ে দেশে যান। আর আমি এখানে মিরাণ্ডার ভাঙা মন জোড়া দেবার জন্য ওর সঙ্গে খুব বেশি সময় কাটাতে থাকি। ফল যা হবার তাই হল। মিরান্ডা হঠাৎ একদিন বলল, 'আমাকে বিয়ে কর।' আমি জানতাম এটা ওর রোমান্স অন দ্য রিবাউন্ড।' তবু বিয়ে করলাম।

'রোমান্স অন দ্য রিবাউন্ড মানে কি ?'
'প্রেমিক ছেড়ে গেলে মনের কষ্টে অতি দ্রুত অন্য একজনের প্রেমে পড়ে যাওয়া। এটা ঠিক খাঁটি প্রেম নয়। এ প্রেম বেশিরভাগ সময়ই টেকে না। শুধু নিঃসঙ্গতা আর তীব্র মনোকষ্ট চাপা দেবার জন্যই ব্যাকুল হয়ে কাউকে আঁকড়ে ধরা—'
'আমাদের দেশের ট্যাগোরও একটা গল্পে এই ধরনের কথা লিখেছেন—এক ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেতে না পেতে দ্বিতীয় ভ্রান্তি পাশে পড়বার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যাকগে তোমায় বাধা দিলাম। তারপর ?'
'তারপর কিছুদিন কাটলো। একদিন বাবার সঙ্গে কি নিয়ে যেন ঝগড়া হল। ব্যস রাগ করে মিরাণ্ডার সঙ্গে স্যানডিয়েগো চলে গেলাম। স্যানডিয়েগোয় মিরাণ্ডার বাবার বাড়ি। ওর বাবাও খুব বড়লোক। মিরাণ্ডা ওখানেই রেসিডেন্সি করল। ইতিমধ্যে আমার বাবা মারা গিয়ে ঝামেলা বাঁধিয়ে দিলেন। আমাকে ফিরে আসতে হল। আমি ভাবিনি এ-রকমটা হবে। তোমাকে দেখে খুব খুশী হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম সব ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু হল না।'
দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সাকিনা মৃদু স্বরে বলল, 'ওর মা মত দিলেই তো পারতেন। এইতো আমাদের পড়শী সাইফ বিদেশী মেয়ে বিয়ে করেছে। ওর মা তো আপত্তি করেননি। ওরা কেমন সুখে আছে। সাইফের মা'ও খুব খুশী বিদেশী বউ নিয়ে।'
'সবাই তো একরকম হয় না। তোমাকে রকিব কিছু বলেছে এ বিষয়ে ?'
'কিছুই না। বলেছে ক্যালিফোর্নিয়া খুব সুন্দর স্টেট। স্যানডিয়েগো আরো সুন্দর। ছবির মত। ওখানে বরফ পড়ে না। ওখানে বোর্ড পরীক্ষায় পাস করলে আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে। এখন থেকেই ও বাসা খুঁজতে থাকবে—ওখানে বাসা পাওয়া খুব শক্ত—এইসব।'
'কি মিথ্যেবাদী। অথচ মিরাণ্ডা আমাকে খোলাখুলিই বলে গেছে যে সে রকিবের সঙ্গে বাস করার জন্য আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। পরে যথাসময়ে ডাইভোর্স স্যুট ফাইল করবে।'
সাকিনার গলায় ঝাঁঝ ফুটল, 'তুমি আমাকে আরো আগে বলনি কেন ?
'বললে কি ঠেকাতে পারতে ? আর বলবই বা কি করে ? এসব কথা কি হুট করে বলা যায় ? তুমিও তো কিছু বুঝতে পারনি। পেরেছিলে ?'
'না ঠিক পারিনি। তবে ধোঁকা একটা লেগেছিল। কিন্তু ভিত্তিহীন সন্দেহ নিয়ে কি কিছু বলা যায় ?'

'তাহলে ?'

'তাহলে বলে পার পাবে না। আমি কিছু জানতাম না বলেই আমার মনে হয়েছে ভিত্তিহীন সন্দেহ। কিন্তু তুমি তো আগের ঘটনা জানতে ? তোমাদের সন্দেহ বা ভয় তো অমূলক ছিল না। রকিব যখনি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট বোর্ডের পরীক্ষা দিতে চেয়েছে, তখনি আমার মনে কু গেয়েছে। ওকে বাধা দেবার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু ও গেলই। সেপ্টেম্বরের আট-নয় তারিখে পরীক্ষা, ও দেড় মাস আগে গেল ভাল করে পড়াশোনা করবে বলে। আমি জীবনে কোনদিন একা ঘরে থাকিনি। একা বাড়িতে তো দূরের কথা। এদেশে কোন ভয় নেই, হাজার হাজার মেয়ে একা বাস করে। তুমি গাড়ি চালাতে পার। আমার গাড়িটা রইল—এই সব বুঝিয়ে ও চলে গেল। এখন আমার কি হবে ?' সাকিনা স্বাভাবিক বিষণ্ণ গলায় কথা বলছিল, কিন্তু 'এখন আমার কি হবে' বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার বুক ঠেলে কান্নার ঝাপটা এল, সে দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু জড়িয়ে সেখানে মাথা গুঁজে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

স্ট্যানলি বিচলিত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলতে লাগল, 'কেঁদ না সাকিনা, কেঁদ না। কোন ভয় নেই, আমি তো আছি। আমার দুঃখও তোমার চেয়ে কম নয়। আমার দিকে চেয়ে দেখ।'

সাকিনা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, এক পা পিছিয়ে চোখ মুছে বলল, 'স্ট্যানলি তুমি এখন যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

'সিওর।'

স্ট্যানলি চলে গেলে দরজা বন্ধ করে সাকিনা খানিকক্ষণ উদভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সেখানেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

কতক্ষণ কেঁদেছে, সময়ের কোন হিসেব ছিল না। মনে হয় একযুগ। একসময় চোখ মুছে উঠে বসল, সূর্য প্রায় ডুবুডুবু। তাহলে নটা বেজে গেছে। এখন তো দিন ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে।

এখন সে কি করবে ? কাকে বলবে ? বাবা মা ভাই বোন কতো দূরে। যেতে গেলে কয়েক হাজার ডলার, ফোন করতেও পঞ্চাশ-ষাট ডলার। কিন্তু কাউকে বলা দরকার, কারো বুকে মাথা গুঁজে কাঁদা দরকার। তার দম আটকে আসছে, এই ঘরে বোধহয় একফোঁটা বাতাস নেই। সে দৌড়ে গেল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল জাহানারা ইমামকে, 'খালাম্মা, এক্ষুণি একটু আসতে পারবেন আমার বাসায় ?'

'কি হয়েছে সাকিনা ? তোমার গলা ভারী ? কাঁদছ নাকি।'

'এখুনি আসেন।' কাঁদতে কাঁদতে ফোন রেখে দিল সাকিনা।

॥ তের ॥

ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘর ছুঁইছুঁই করছে। চারদিক নিশুতি হয়ে এসেছে। সবাই নিজের নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। সাকিনার চোখে ঘুম নেই একফোঁটা।

জাহানারা ইমাম রাত এগারোটা পর্যন্ত থেকে চলে গেছেন। তিনি আসার পর সাকিনা প্রথমে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে খুব কেঁদেছিল। তিনিও মায়ের মত স্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর মৃদুকন্ঠে প্রশ্ন করে করে সব জেনে নিলেন। কারণ, সে ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারছিল না। সব বলার পর সাকিনা আবার আকুল কান্নায় ভেঙে প'ড়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন আমি কি করব খালাম্মা?'

খালাম্মা বলেছিলেন, 'কি করবে, সে সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে সাকিনা।'

সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে? সে কি জীবনে কোনদিন নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছে? না, কেউ তাকে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিয়েছে? সে কি পড়বে, বাবা-মা ঠিক করে দিয়েছেন, সে কাকে বিয়ে করবে, বাবা-মা-খালা ঠিক করে দিয়েছেন। প্রথম বাচ্চা হবার সময় বাবা মা ভাই বোনের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অচেনা দেশে এসেছে—সেটাও তার স্বামী ঠিক করে দিয়েছে। আর এখন তার জীবনের কঠিনতম সংকট ও সর্বনাশের সময় সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে?

খালাম্মার মুখে কথাটা শোনার পর সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তার নিজের মা হলে কি এমনভাবে বলতে পারতেন? জাহানারা বোধকরি বুঝতে পেরেছিলেন তার মনের কথা। বলেছিলেন 'দেখ মা, আমাদের দেশে বাবা মায়েরা মেয়েদের মানুষ করে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল ক'রে। বিয়ের আগে নিজেদের আশ্রয়ে আগলে রাখে, বিয়ে দিয়ে স্বামী-শাশুড়ীর খোঁয়াড়ে ভরে দেয়। তাই কোন মেয়ের জীবনে যখন এরকম সর্বনাশ ঘটে যায়, সে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। যদিবা কেউ অর্থনৈতিকভাবে অসহায় নাও হয় মানসিকভাবে স্বামী হারিয়ে একেবারে ভেঙে পড়ে। কেননা, ছোটবেলা থেকে সে নিজেকে মেয়ে হিসেবেই ভাবতে শিখেছে, নিজেকে সেইভাবে গড়ে তুলেছে। কিন্তু ভেবে দেখ, বাপ-মা যদি ছেলেমেয়ে দু'জনকেই সমান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন, মেয়েটা যদি ভাবতে শেখে সে আগে মানুষ, তারপর মেয়ে, তাহলে জীবনের

নানা দুর্ঘটনায় তার কিন্তু এতটা ভেঙে পড়ার কথা নয়। সে কষ্ট পাবে—যেমন কষ্ট একজন স্বামী পায় স্ত্রী ছেড়ে গেলে। কিন্তু সে তো ভাবে না—এটাই তার জীবনের শেষ। তাহলে তুমি কেন ভাববে তোমার জীবনের সুখ-শান্তি সব চলে গেল? মাত্র একজন মানুষের জন্য তোমার সারা জীবন তো নষ্ট হতে পারে না। তুমি নিজেকে একজনের বউ না ভেবে পুরো একটা মানুষ হিসেবে ভাবতে চেষ্টা কর, দেখবে দুঃখটা অনেক সহজ হয়ে আসবে, সিদ্ধান্ত নেওয়াও সহজ হবে।'

তখন খালাম্মার কথাগুলো বক্তৃতার মত মনে হয়েছিল। আসলে উনি বক্তৃতাই দিচ্ছিলেন। এখন সাকিনা বুঝতে পারছে—ঐ বক্তৃতার দরকার ছিল। খালাম্মা বলেছিলেন, 'তোমাকেই ভেবে ঠিক করতে হবে, তুমি দেশে ফিরে যাবে কিনা বাবা-মার কাছে। দেশে ফিরে গিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে কিনা।'

না, তা সে পারবে না। বাবা মা খুব সাদাসিদে, নিরীহ। অল্প আয়ের মানুষ। সে এভাবে ফিরে গেলে তাঁদের বুক ভেঙে যাবে। সেও তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

খালাম্মা বলেছিলেন, 'এদেশে থাকতে পারবে কিনা, সেটাও তোমাকেই ভেবে ঠিক করতে হবে। তুমি গাড়ি চালানো শিখেছ। গাড়িও একটা আছে। এখানে আমার তিনজন ভাই আছে, তারা ডাক্তার, প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। তাদের বলে তোমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তুমি ভেবে দেখ, চাকরি করে এদেশে একা থাকতে পারবে কিনা। তোমার সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে আমরা কেউ কিছু করতে পারিনা। আমরা বড়জোর তোমাকে পরামর্শ দিতে পারি, সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ? নো মাই চাইল্ড, ডিসিশন মাস্ট বি কমপ্লিটলি ইয়োরস।'

তখন খালাম্মাকে একটু হৃদয়হীন মনে হয়েছিল। কোন জবাব দেয়নি। খালাম্মাও বহুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'তাছাড়া রকিব তো এখনো তোমাকে কিছু বলেনি। মিরাণ্ডা স্ট্যানলিকে ছেড়ে চলে গেছে রকিবের কাছে—এটা স্ট্যানলির খবর। মিরাণ্ডা বলেছে স্ট্যানলিকে। কিন্তু মিরাণ্ডা স্যানডিয়েগো যাবার পর রকিবের তাকে ভাল নাও লাগতে পারে। তখন তার হুঁশ ফিরতে পারে—একি করছে সে বউ ফেলে!'

সাকিনা প্রচণ্ড আবেগে প্রতিবাদ করে বলে উঠেছিল, 'আমি কক্‌খনো তাকে আর ফিরে নিতে পারব না। সে আমাকে ফেলে অন্য মেয়ে নিয়ে থাকার পর কি করে আমি আবার—'সাকিনার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রবল অশ্রু পাতের সঙ্গে সে খালি মাথা নেড়েছিল, 'না, কিছুতেই না—'

জাহানারা একটুখানি হেসেছিলেন, 'জীবনটা কি অতই সোজা, অংকের মত? এখানে সবসময় কি দুয়ে দুয়ে চার হয়? মানুষের পা পিছলায় না? হাড় ভাঙে না? অনেক কষ্টের পর ভাঙা হাড় জোড়া লাগে, আবার মানুষ হাঁটে। রকিবকে তার ভুল শোধরাবার একটা চান্স তো দেবে।'

জাহানারার কথাগুলো তখন তাঁর আগের বলা কথার বিরোধী বলে মনে হয়েছিল। এখন রাত্রির শেষ-যামে কথাগুলোর অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। রাত্রিবেলা মানুষের পরিষ্কারভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ে নাকি? এখন তার সমস্ত মন-প্রাণ-দেহ-শিরা-উপশিরা রকিবের জন্য হাহাকার করছে। মনে হচ্ছে, রকিব যদি একবার তার সামনে এসে দাঁড়ায়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে এমন কঠিন বাহুর বাঁধনে বেঁধে ফেলবে—যাতে জীবনেও সে বাঁধন খুলতে না পারে। পাশের বেড-সাইড টেবিলে রাখা রকিবের হাসিমুখের ফটোটা তুলে বুকে চেপে সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল, বাঁধ-ভাঙা কান্নার সঙ্গে বার বার করে বলতে লাগল, 'ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে এসো।'

কাঁদতে কাদতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঝনঝন করে ফোন বাজতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সারা ঘর রোদে ভরে গেছে। পাশের টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল—সাড়ে দশটা। উঃ, এতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে? ফোনের রিসিভারটা তুলে ঘুম জড়ানো গলায় 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে জাহানারা ইমামের গলা ভেসে এল, 'ঘুম ভাঙালাম বুঝি? এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে, ভাবিনি। রাত্রে ঘুমোতে পারনি, তাই না?'

'হ্যাঁ খালাম্মা, ভোরের দিকে ঘুমিয়েছি।'

'শোনো। আজ রাতে ডাঃ নাসিরের বাসায় কোরবানী ঈদের পার্টি। তোমারও দাওয়াত সেখানে। পাঁচটার দিকে তৈরী থেক। আমরা সবাই সাড়ে পাঁচটায় বেরোব। আর হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে একটা করে খাবার রান্না করে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি তোমার সুবিধেমত একটা কিছু বানিয়ে নিয়ো? কেমন?'

'কতো লোক হবে খালাম্মা? বেশি বাঙালীর ভিড়ে আমি যাব না। সবাই তো আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করবে, তখন?'

'না, না, যেটা আনুষ্ঠানিক ঈদ পার্টি হয় বড় করে, এটা সেটা নয়। এটা নাসিরের বাড়িতে প্রাইভেট পার্টি। ওর নিজের ভাই, বোন, ভাগনে, ভাগনী আর অন্য দুজন ডাক্তার—তাদের বউ নিয়ে যাবে। ঐ যে বলেছিলাম না—তিন ডাক্তার আছে আমার ভাই শুধু তারাই যাবে। দুপুরের মধ্যেই আমি ওদের তিনজনকেই তোমার কথা বলে রাখব।

ওরা কেউ তোমাকে পরিচয় জিজ্ঞেস করবে না। তোমার চাকরির ব্যাপারে তোমাকে হেল্প করতে পারবে। ওদের সাথে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার।'

একটা কিছু খাবার বানাবার ধান্ধায় সারাটা দিন সাকিনার বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কেটে গেল। মন খারাপ করার বিশেষ সময় পেল না। সে খানিকটা পোলাও চালের জর্দা বানিয়েছে। এত অল্পসময়ে অন্য কিছু বানাবার সময় ছিল না। পাঁচটার সময় সে পরল একটা সরু পাড়ের সাদাসিদে কাতান শাড়ী, লম্বা চুল আঁচড়ে খোলা রেখে দিল। মনে পড়ল দু'বছর আগের ঈদের দিন সকালের সেই বাকবিতণ্ডা—রকিব তাকে চুল খোলা রাখবার জন্য জেদ করছে, আর সে খোঁপা বাধার জন্য জেদ করছে। মাত্র দু'বছর আগে? না, দুবছরও হয়নি। সে এসেছিলই তো গত বছরের রোজার ঈদের আগে আগে। সেই ঈদের পর এবছর রোজার ঈদে হয়েছে একবছর। তারপর আড়াইমাস পরে এই কোরবানীর ঈদ হয়েছে গেল দুদিন আগে। তার মানে সোয়া বছর। মাত্র সোয়া বছরে তার জীবনে কি অচিন্তনীয় পরিবর্তন! শুধু কি পরিবর্তন? অকল্পনীয় সর্বনাশ। কি করে পারল রকিব? রকিবের প্রতি ক্রোধে, বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল তার। সেই সঙ্গে রকিবের মা'র প্রতিও। কেন তিনি ছেলেকে তার ইচ্ছামত বিয়ে করতে দেননি? দিলে কার কি ক্ষতিটা হত? বাঙলী মেয়ে বিয়ে করিয়ে তাঁর কি হাতী-ঘোড়া লাভ হল? মাঝখান থেকে একটি নিষ্পাপ, নিরীহ মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

না, জীবন নষ্ট হতে সে দেবে না। মনে পড়ল গতরাতে খালাম্মার 'লেকচারের' কথা ঃ কোন একজন মানুষের অভাবে অন্য একটি মানুষের জীবন নষ্ট হয় না, হতে পারে না। স্বামী চলে গেলে শুধু বাঙালী মেয়েরাই এ ধরনের কথা ভাবতে পারে। কিন্তু জীবন তো তা বলে না। চারদিকে চোখ মেলে দেখ। পৃথিবীতে অহরহই মানুষ এ ধরনের চোট পাচ্ছে। আবার সেরেও উঠছে কিছুদিন কষ্ট পেয়ে। আসল কথা হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তুমি যদি নিজে রোজগার করতে পার, খাওয়া-পরা-থাকার জন্য কারো ওপর নির্ভর করতে না হয়, তাহলে দেখবে এসব মনের কষ্ট কাটিয়ে ওঠা যায়। ক্ষতচিহ্ন অবশ্য একটা থাকবে। হাত-পা ভাঙলে বা কাটলে যেমন সেরে যায়, ক্ষত চিহ্ন একটা থাকে কিন্তু তাতে আর ব্যথা লাগে না। তেমনি মনের মধ্যেও একটা ক্ষত চিহ্ন তোমার থাকবে। কিন্তু দেখবে, তাতে পরে আর কোন কষ্ট থাকবে না মনে। আবার তুমি কাউকে ভালো-বাসবে, বিয়ে করবে, আবার তোমার বাচ্চা-কাচ্চা হবে।'

গতরাত্রে তিনঘন্টা ধরে খালাম্মা কতোরকম কথাই যে বলেছেন। মাঝে মাঝে সেগুলো পরস্পর বিরোধীও মনে হয়েছে। একবার রকিবকে ভুল শোধরাবার সুযোগ দেবার কথাও বললেন। এখন সে বুঝতে পারছে, খালাম্মা তার মনের সবকটা অন্ধি-সন্ধি ওলোট পালট করার জন্য ওভাবে বলেছিলেন। যাতে নিজের মনটাকে সে নিরাবরণ করে দেখতে পারে, বুঝতে পারে। কাল রাতেও সে রকিবের ছবি বুকে নিয়ে কেঁদেছে 'ফিরে এসো' বলে। কিন্তু এখন আর সেরকম আবেগ তার মনের মধ্যে নেই। ও আবেগ মিথ্যে, ঐ বাঙালী সেন্টিমেন্ট ভিত্তিহীন। ও শুধু বাঙালী মেয়েদের মনকে পরনির্ভরশীল করে রাখে, তাদেরকে শুধু কন্যা, স্ত্রী, মা হিসেবে চিহ্নিত করে রাখে ; তাদেরকে মানুষ হিসেবে নিজেদের দুই পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে দেয় না।

নিচে টুংটাং বেল বাজল। সাকিনা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দরজা খুলে দিয়েই অবাক। ফ্রিডা চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ী লাল কাচের চুড়ি লাল টিপ পরে একেবারে লক্ষ্মী-বউ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল 'ওমা কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে! তুমি শাড়ি পরতে পার জানতাম না তো? কখনো পরতে দেখিনি।'

'এই রকম স্পেশাল অকেশানে পরি। তোমাকেও কিন্তু চমৎকার দেখাচ্ছে ফিরোজা রঙের শাড়ীতে। তোমার টিপটাও খুব সুন্দর ম্যাচ করছে। কই এসো, আমরা এখন রওনা দেব।'

'দাঁড়াও আমার খাবারের বাটিটা নিয়ে আসি। তুমি কি বানালে?'

'আমি চীজ-বল বানিয়েছি। এটা আগেও একবার বানিয়েছিলাম। ওরা সবাই খুব পছন্দ করেছিল।'

সাকিনা তার জর্দার বাটিটা ধরে বেরিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দেখে একটা বাটি হাতে জামী আর তার মা গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে। জামীর পরনে রাজশাহী সিল্কের সুন্দর কাজ-করা পাঞ্জাবী আর ফুলপ্যান্ট। জাহানারা আজ মাথায় তাঁর পরচুলোটা পরেছেন, রাজশাহী সিল্কের শাড়ির ওপর আজকেও একটা গরম শাল জড়ানো।

সাকিনা হেসে বলল, 'জামী ভাই, কি সুন্দর পাঞ্জাবীটা। যা মানিয়েছে আপনাকে! খালাম্মা, আজকেও আপনার শীত গেল না। উইগটাতে খুব মানিয়েছে কিন্তু। আপনি সব সময় পরে থাকেন না কেন।'

'মাথার চাঁদি চুলকোয় যে? দাঁড়াও না, আমার নিজের চুল আর ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হোক, তারপর উইগটা ডাস্টবিনে ফেলে দেব।'

'না না খালাম্মা, ওটা স্মৃতি হিসেবে ঢাকার বাড়িতে শোকেসে রেখে দেবেন।'

সাকিনার উৎফুল্ল ভাব দেখে জাহানারা অতি সন্তর্পণে একটা স্বস্তির

নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

॥ চোদ্দ ॥

ওরা নাসিরের বাড়িতে পৌছে দেখে ওদের আগেই অনেকে এসে গেছেন। নাসির সবাইকে নিয়ে বাইরের বাগানে ছবি তুলছিলেন। জাহানারাকে দেখে সবাই ঈদ মোবারক বুবু আসুন, আসুন বলতে বলতে এগিয়ে এলেন। সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করার পর জাহানারা সাকিনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার 'শামু, নাসির, মাদু, এ হল সাকিনা, আমার এক বোন ঝি। আর সাকিনা এই যে আমার তিন ভাই—ডাঃ নাসিরুল হক, ওর বউ লীনা, ওদের দুই মেয়ে মোনা আর সোনা। এ ডাঃ শামসুল হক—ডাকি শামু বলে, এর বউ এই যে জোসেফিন অর্থাৎ জো, এদের ছেলে তাসির। আর ও হল ডাঃ মোশাররফ আহমদ ওর ডাক নাম মাদু যেটা ও পছন্দ করে না, ওর বউ ডায়ানা, আমরা ডাকি ডাই।' জাহানারার পরিচয় করানোর ভঙ্গীতে সবাই খুব হাসলেন, সাকিনার সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে। নাসির বললেন, 'বুবু আমরা মুভি তুলছি। আপনিও আসুন। এই জামী, এদিকে আয়। ফ্রিডা কই?'

ফ্রিডা তাদের আর সাকিনার খাবারের বাটি রাখতে গিয়েছিল ভেতরে, তক্ষুণি দরজা খুলে বাইরে এসে চেঁচাল, 'এই যে মামা, আমি এখানে হাজির।'

জাহানারা বললেন 'নাসির একটা রিকোয়েস্ট, আমার ছবি তুলোনা। বুঝতেই পারছ! রোজার ঈদে তো তুলেছো তখন অপারেশান হয়নি। এখন অপারেশানের পরে—'

'ঠিক আছে বুবু ঠিক আছে। আই আণ্ডারস্ট্যান্ড।'

সাকিনার কষ্ট হল জাহানারার দিকে চেয়ে। অপারেশানের পর ওঁর মুখের আদল খানিকটা বদলে গেছে। জিভটা একটু বেরিয়ে থাকে, নিচের একটাও দাঁত নেই, কথা জড়ানো, পাশ থেকে দেখলে একশো বছরের বুড়ির মত দেখায়। যদিও উনার বয়স এখনো ষাট পেরোয়নি।

ফ্রিডা জামী সাকিনাকে নিয়ে নাসিরের ক্যামেরার সামনে দাঁড়াল। নাসিরের এক বোন, তাঁর স্বামী ও ছেলে রয়েছেন নাসিরের বাড়িতে। একটু পরে শামুর বোন সাজু তাঁর স্বামী বকুল ও তিন ছেলেমেয়ে লিজা, তাজ ও রনি এসে পৌঁছোলেন। তাঁদের গাড়ির বুটি থেকে বেরোল বড় একটা ডেকচি, একটা মুখ বন্ধ প্লাস্টিকের গামলা আরো কি কি যেন। ছবি টবি তোলা হতে হতে সাতটা বাজল। এবার সবাই ভেতরে চললেন।

খাবার সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। নাসিরের বউ লীনা বাঙালী মেয়ে, শামুর বউ আমেরিকান। মাদুর বউ ব্রিটিশ। কিন্তু আজ ওদের দুজনের পরনেই শাড়ি। কথায় কথায় জানা গেল সাজুর মেয়ে লিজা এই দুই মামীকে শাড়ি পরতে সাহায্য করেছে।

টেবিলে সবার আনা সবরকম খাবার সাজানো হয়েছে। নাসিরের বাড়িটা বিরাট। অন্য দুই জায়গায় আরো দুটো খাবার টেবিল পাতা আছে। যে যার মত খাবার তুলে ইচ্ছেমত চেয়ারে বসে বা দাঁড়িয়ে খাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে গল্প করছে। জাহানারা একটা টেবিলের সামনে বসে খাচ্ছেন। সাকিনা প্লেট হাতে তাঁর পাশে বসে বলল 'আপনার তিন জন ভাই আছেন এখানে, জানতাম না তো? ওদের চেহারার মধ্যে মিল নেই কিন্তু। একেকজন একেক রকম দেখতে।'

জাহানারা হেসে ফেললেন, 'শোনো বলি। ওরা আমার মায়ের পেটের ভাই নয়, কিন্তু মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ১৯৫২ সালে ওরা ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত। তখন থেকে ওরা তিন বন্ধু আমাকে বুবু বলে ডাকা শুরু করে। সেই থেকে এই এত বছরে ওরা আমার আপন ভাইয়ের মতই হয়ে গেছে। ওরা এখানে আছে বলেই জামীকে এখানে পড়তে পাঠিয়েছিলাম। ওরা তিন বন্ধুও কিন্তু আপন ভাইয়ের মতই ঘনিষ্ঠ। শামু প্রথমে একষট্টি সালে এদেশে আসে। নাসির কয়েকবছর এদেশে চাকরি করে আবার দেশে ফিরে যায়। পরে একাত্তর সাল থেকে শামুই কিন্তু একে একে ওর দুই বন্ধুকে বলে-বুঝিয়ে স্পনসর করে এদেশে আনিয়েছে। নিজের ছোট বোনকেও তাদের পুরো ফ্যামিলি সহ স্পনসর করে আনিয়েছে। ওরা সবাই এখানে না থাকলে জামীকে আমি কিছুতেই এদেশে পাঠাতাম না।'

'তাই তো দেখছি, জামী ভাই কেমন মামা-মামী খালা-খালু পেয়ে গেছে।'

'সত্যি তাই, ওরা এখানে একটা নিজস্ব পরিবেশ গড়ে তুলেছে। সবাই নিজের নিজের পেশায় খুবই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু উৎসবে-পরবে-বিপদে-আপদে সবাই সবার পাশে এসে দাঁড়ায়। এই পরিবেশটা গড়ে তোলার বাহাদুরী কিন্তু শামুর একার।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েও হতে চায় না। প্রত্যেক বাড়ি থেকে কিছু রান্না করে আনতে বলার ফলে আইটেম অনেক বেশী হয়ে গেছে। মিষ্টি পদও চার পাঁচ রকমের। সাকিনার জর্দা খেয়ে সবাই খুব প্রশংসা করলেন। একটি লম্বা, স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণী উদ্বৃত্ত খাবার গুছিয়ে রাখছিল, সাকিনা ফিসফিস করে বলল, 'উনার সঙ্গে কিন্তু আলাপ হয়নি।'

'ও হচ্ছে মলি। নাসিরের ছোট ভাই বাদশার বউ। দাঁড়াও খেয়ে উঠে পরিচয় করিয়ে দেব।'

জাহানারার খেতে অসম্ভব বেশী সময় লাগে। নিচের কোন দাঁত নেই, চিবিয়ে খেতে পারেন না, নরম পোলাও, মুরগীর রান, মাছ, সব্জী সব আঙুলে পিষে ছোট ছোট লোকমা বানিয়ে গিলে গিলে খান। সবার দ্বিতীয় দফা সেমাই, ফিরনী, জর্দা, আঙুর, তরমুজ খাওয়া চলছে, উনি এখনো পোলাও খাচ্ছেন।

সাকিনা আবার চুপিচুপি বলল, 'বিদেশী বউ দু'জন—তখন যে পরিচয় করিয়ে দিলেন—কোনটা কে, গুলিয়ে ফেলেছি।'

'ঐ যে সিংকের সামনে দাঁড়িয়ে বাসনের এঁটো চেঁছে ফেলে ডিস-ওয়াশারে ঢোকাচ্ছে ও হল জো। শামুর বউ। আর ঐ যে ঐ দিকে মলিকে খাবার গোছাতে হেলপ করছে; ও হল ডাই, মাদুর বউ। একটা জিনিস খেয়াল রাখবে—জো'র হল লালচে বাদামী চুল, ছোট করে কাটা। ডাইয়ের কালো চুল, খোঁপা বাঁধা। তাহলেই আর গুলিয়ে ফেলবে না।'

নাসির এসে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন, 'বুবু খাচ্ছেন তো ঠিকমত?'

'হ্যাঁ ভাই, খুব পেট ভরে খেয়েছি। বেশ নরম ছিল সব রান্না।'

'নাসির, মলিকে একটু ডাকো না? সাকিনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

মলিকে একটা হাঁক পেড়ে নাসির অন্যদিকে চলে গেলেন। মলি এগিয়ে এসে হাসি মুখে বলল, 'কেমন আছেন বুবু? খেতে পেরেছেন তো?'

'হ্যাঁ ভাই, খুব ভাল করে খেতে পেরেছি। তোমার মেয়ে কেমন আছে।'

'মেয়ে এখন কিছুটা ভাল। এই তো তিন চার দিন হল হাসপাতাল থেকে ফিরেছে।'

'মলি, আমার এক বোনঝির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এর নাম সাকিনা, আর সাকিনা—মলির পরিচয় তো আগেই দিয়েছি তোমায়।'

আদাব দিয়ে সাকিনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মেয়ের কি হয়েছিল? হাসপাতালে কেন?'

মলি কিছু বলার আগে জাহানারাই বললেন, 'ওর বাচ্চার জন্মের থেকেই হার্টের একটা অসুবিধে আছে। তোমাকে পরে বলব। মাঝে মাঝে হাসপাতালে যেতে হয়।'

জাহানারা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন, 'যাই মুখ ধুয়ে আসি।'

মলি সাকিনাকে জিজ্ঞেস করল 'কতদিন হল এসেছেন?'

সাকিনা ভেতরে ভেতরে একটু শিঁটিয়ে গেল, 'এই তো বছর দেড়েক। আপনার মেয়ের বয়স কত? কি নাম?'

'ওর নাম জেনিফার। বয়স চার মাস। দেখবেন ওকে? আসুন আমার সঙ্গে।' যেতে যেতে মলি খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'জেনিফার হার্টের একটা ডিফেক্ট নিয়ে জন্মেছে। ওর জন্মের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ওর ওপেন হার্ট সার্জারি হয়।'

সাকিনা আঁতকে উঠল, 'বলেন কি?'

'হ্যাঁ, দুমাস পরে আবার একটা অপারেশান হয়। চার মাসের মধ্যে বেশির ভাল সময়ই ও হাসপাতালে থেকেছে। ওর সবচেয়ে অসুবিধে হল—ও বুকের দুধ টেনে খেতে পারে না। দু চারটান দিয়ে হাঁপিয়ে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে। অথচ পেটে খাবার না গেলে তো বাঁচবে না। তাই নাকে নল ঢুকিয়ে ওকে দুধ খাওয়াতে হয়।'

সাকিনারই মনে হল, সে নিঃশ্বাস টানতে পারছে না। এই রকম মারাত্মক অসুস্থ মেয়ে নিয়ে এই মা এমন স্বাভাবিক? হাসিখুশী, প্রশান্ত?

টিভি রুমের মেঝের পুরু গালিচার ওপর জেনিফারকে শুইয়ে নাসিরের দুই মেয়ে ওর দু'পাশে বসে ছিল। বসে ছিল আরো দুটি ছেলে-মেয়ে—মলি আলাপ করিয়ে দিল, সাজুর মেয়ে লিজা ও ছেলে তাজ। সাকিনাও হাঁটু মুড়ে একপাশে বসল। কি ছোট রোগা, বিষণ্ণ জেনিফার। খুব আস্তে টুকটুক করে হাত পা নাড়ছে। বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে। চোখ দুটো অসম্ভব সুন্দর। সুন্দর আর বিষণ্ণ। সাকিনার মনে হল চোখ দুটো যেন বলছে ঃ ওগো, আমার যে কি কষ্ট ভেতরে, তোমরা কেউ বুঝবে না। হঠাৎ তার নিজের চোখ দুটো ভিজে উঠল। সে মনে মনে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলাল। এইসব সদ্য পরিচিত লোকের মধ্যে চোখের পানি গড়িয়ে পড়লে কেলেংকারী হবে।

জাহানারা ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই যে তুমি এখানে? চল, এবার যেতে হয়।'

সাকিনা উঠে দাঁড়াল। মলি লক্ষ্য করেছিল সাকিনার ভাবান্তর। সেও ওঠে দাঁড়িয়ে সাকিনার হাত ধরে বলল, 'সুযোগ পেলে আসবেন আমাদের বাড়িতে।'

সাকিনা গাঢ়স্বরে বলল, 'আসবো। খালাম্মাকে বলব নিয়ে যেতে।'

'বুবুকে একদিন বাসায় খেতে ডাকব, ভেবেছি। সেদিন আপনিও আসবেন কিন্তু। এক পাড়াতেই তো থাকেন। বুবুদের সঙ্গেই আসবেন।'

জাহানারা শুনতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'বাচ্চা নিয়ে চব্বিশ ঘন্টায় এক মুহূর্ত স্বস্তি নেই, এর মধ্যে আবার খাওয়ানোর কথা কেন?'

'না বুবু এ ঝঞ্ঝাট তো থাকবেই, তাই বলে জীবন তো থেমে থাকছে না। সবই চলছে। মাঝে মাঝে এ বাড়ি ও বাড়ী না করলে ভালোও তো লাগে না।'

'তা সত্যি বটে। তোমার সাহসের আর ধৈর্যের আমি প্রশংসা করি মলি।'

লীনা এসে দাঁড়িয়েছিলেন ওদের পাশে। মলির বড় জা। তিনি বললেন, 'আজকের পার্টি'র অতগুলো আলুকপি ভাজি স-ব মলি একা করে এনেছে। আবার দুধ-সেমাইও রেঁধে এনেছে।'

সাকিনা বলল, 'ওরে বাবা—অতগুলো আলু-কপি চিকন করে কেটে শেষ করাই তো বিষম ব্যাপার। তারপর ভাজতে গিয়ে যেন গলে ঘ্যাট হয়ে না যায়, সেই ভয়টাও কম নয়। আমার তো মনে হয়—আলু-কপি ভাজির চেয়ে কোরমা রান্না বেশী সহজ।'

সবাই হেসে উঠল। জামী আর ফ্রিডা দুজনে দুহাতে কয়েকটা প্লাস্টিকের ঢাকনা-বন্ধ বাটি সাবধানে ধরে দরজার কাছ থেকে বলল, 'মা, চল।'

সাকিনা বলল, 'ওগুলো কি?'

'ছাঁদা।' জাহানারা হেসে বললেন, 'খাবার বেশী বাঁচলে সবাইকে ভাগ করে দিয়ে দেওয়া হয়।'

জামী বলল, 'আপনার জন্যও একটা বাটি আছে সাকিনা—আপা।'

দরজার কাছে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই প্রায় যাবার মুখে। সবাই সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। জাহানারা জোকে বললেন, 'তাহলে কাল এগারোটার সময় আসছ?'

'হ্যাঁ বুবু, এগারোটায়। দেখা হবে।'

গাড়িতে বসার পর জাহানারা বললেন, 'সাকিনা, কালকে জো আসবে তোমার একটা চাকরির ব্যাপারে আলাপ করতে। তুমি এগারোটার সময় তৈরী থেক। জো তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। তারপর দরকার হলে কালই তোমাকে নিয়ে ও বেরোতে পারে। ওর এক বন্ধুর ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে। দেখা যাক।'

উত্তেজনায় সাকিনার সারা শরীর শিরশির করে। কি এক আবেগে গলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। কথা বলতে পারে না। শুধু দুই চোখে কৃতজ্ঞতা উপচিয়ে সে পাশ ফিরে তাকায় জাহানারার দিকে। জাহানারা তার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জোসেফিন খুব সুসংবদ্ধ চিন্তাধারার মানুষ। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ভিসা কি টাইপের ?'

সাকিনা ঠিক জবাব দিতে পারল না, জোসেফিন তখন বললেন, 'তোমার কি গ্রীনকার্ড আছে ?'

এবার সাকিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার গ্রীনকার্ড আছে।'

'বাঁচালে! তারমানে তোমার কোথাও চাকরি করতে কোন বাধা হবে না। জে-ভিসা হলে মুশকিল হয়ে যেত। তোমার স্বামী কি এদেশের সিটিজেনশীপ পেয়ে গেছে ? না, এখনো পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ?'

'ঠিক জানিনা।' সাকিনার নিজেকে খুব মূর্খ বলে মনে হল। স্বামীর সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো সে এখনো জানে না। কেন রকিব তাকে বলেনি ? তার যে গ্রীনকার্ড আছে, তাই তো সে জানত না কয়েকমাস আগেও। একটু ঠেকে ঠেকে বলল, 'ওর আপন চাচা আছেন এদেশে, উনি সিটিজেন, তা জানি।'

জো আর কথা বাড়ালেন না, সংক্ষেপে বললেন 'তাই হবে। চাচা নিশ্চয় রকিবকে স্পনসর করে এদেশে এনেছেন। সিটিজেন না হলেও পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট তো বটেই। তা না হলে তোমার গ্রীনকার্ড হত না। যাক সে কথা। তুমি পড়াশোনা করেছ কদ্দূর ? কোন বিষয়ে ? কিছু মনে কোরো না যেন, এতসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি বলে।'

'না না তা কেন ? আমার জন্যই তো। যা যা দরকার সব জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ছিলাম। হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়াতে পরীক্ষা দিতে পারিনি।'

জোসেফিন জাহানারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনার্সটা কি ? ও কি কলেজ গ্র্যাজুয়েট ? তোমাদের দেশের সিস্টেমটা ঠিক বুঝি না।'

জাহানারা বললেন, 'না ও কলেজ গ্র্যাজুয়েট হতে পারেনি। টুয়েলফথ ক্লাসের পর যে গ্র্যাজুয়েশন সেটা করে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মেজর করছিল— কি বিষয়ে সাকিনা ?'

'বাংলা—'

'ও বাংলায় মেজর করছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা তিন বছরের কোর্স, এটা শেষ করে পরীক্ষা দিলে—'

'বুঝেছি। তুমি তা হলে হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েট। তা এখন একটা

ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি পেতে কোন অসুবিধে হবে না। তবে ট্র্যাভেল এজেন্সির চাকরিতে মাইনে তো বেশী হবে না। তোমাকে প্রথমে কিছু দিন চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে কোন একটা কোর্স করতে হবে। কোন টেকনোলজির ওপর কোর্স—'

'সেটা কি রকম?'

'যেমন ধর রেডিয়োগ্রাফার বা ফিজিয়োথেরাপিস্টের কোর্স। এসব কোর্সে ভর্তি হতে বেসিক কোয়ালিফিকেশান বিশেষ লাগে না। হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েট হলেই হয় অথচ যে কোন হাসপাতালে এসব চাকরিতে মাইনে খুব ভাল। এ বিষয়ে নাসির তোমাকে সব চেয়ে বেশী হেলপ করতে পারবে। ওকল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, ডিরেক্টর—অনেকের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব। তবে ওটা পরের কথা। ও বিষয়ে নাসিরের সঙ্গে আলাপে বসব হয়ত ছয়মাস এক বছর পরে। এখন চলো যাই ইন্টারন্যাশনাল ট্র্যাভেলার্স-য়ে। ওখানে আমার এক বান্ধবী চাকরি করে বহু বছর ধরে। সুরেখা ওর নাম। খুব ভাল মেয়ে। ইণ্ডিয়ান। ওর স্বামীও ডাক্তার। বিয়ে হয়ে এদেশে এসে প্রথম প্রথম খুব মন খারাপ করত। দেশের মা বাবা ভাই বোনদের খুব মিস করত। সেই যে তখন চাকরি নিয়েছিল, এখন ওর দুটো বাচ্চা, এক বোন এক ভাইকে নিয়ে এসেছে ইণ্ডিয়া থেকে, একা লাগার কোন প্রশ্নই ওঠেনা টাকারও প্রয়োজন নেই তেমন তবু চাকরিটা ছাড়েনি। স্রেফ মায়াতে। দেখবে তোমারও খুব ভাল লাগবে। আমি সুরেখাকে যা জানি ও তোমাকে খুব মায়া করবে।'

ফোন বেজে উঠল, সাকিনা বসার ঘর থেকে উঠে রান্নাঘরের দেয়ালে ঝোলানো ফোনের কাছে গেল। 'হ্যালো' বলেই হঠাৎ চমকে এদিকে একবার মুখ ফেরাল। জাহানারা আর জোসেফিন নিজেদের মধ্যে কথায় মশগুল। সাকিনা চাপা গলায় বলল, 'একটু ধরে থাক। নিচে পাশের বাড়ির খালাম্মা আছেন। আমি বেডরুমে গিয়ে ফোন ধরছি।'

বসার ঘরে এসে বলল, 'খালাম্মা, আপনারা একটু বসেন, রকিব ফোন করেছে। আমি ওপরে গিয়ে কথা বলে আসি।'

জাহানারাও হঠাৎ যেন চমকে জমে যান। তারপর সম্বিত ফিরে বলেন, 'হ্যাঁ, যাও, যাও। আমরা বসছি।'

দৌড়ে দোতলায় ওঠবার ইচ্ছেটা প্রাণপণে দমন করে টকটকে মুখ নিচু করে সাকিনা ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। তার বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। কি কি জিজ্ঞেস করবে, যতই ভেবে নিতে চাচ্ছে, সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ফোনে আবার 'হ্যালো' বলতেই রকিবের অসহিষ্ণু গলা শোনা গেল, 'উঠে আসতে এত দেরী করে? লংডিসট্যান্স কলে পয়সা ওঠে না?'
সাকিনা প্রাণপণে বুকের কাঁপন চেপে বলে, 'আগের ঠিকানায় নেই নাকি? আগের ফোনে নো রিপ্লাই হয় যে?'
'ফোন করেছিলে নাকি? তোমাকে না বলেছিলাম তোমার ফোন করার দরকার নেই, আমিই করব?'
সাকিনার হঠাৎ রাগ চড়ে যায়, 'করনি তো প্রায় সাতদিন। একা একা কেমন আছি, সে খোঁজটুকু নেবার কথাও খেয়াল হয়নি? এখন কোন ঠিকানায় আছ?'
'কি ঠিকানা ঠিকানা করছ? নো রিপ্লাই হলেই ঠিকানা বদল হবে কেন? আমি কি চব্বিশ ঘন্টাই রুমে বসে থাকব নাকি? মাঝে মাঝে বাইরে যাব না?'
'তাই বলে রাত দুটোয়? ভোর চারটেয়? সকাল ছটায়? বল তুমি কোথায় থাকছ আজকাল। কার বাসায়? কার সঙ্গে?'
'এসব কি বলছ সাকিনা? কে তোমার মাথায় কি ঢুকিয়েছে?'
'কেউ মাথায় কিছু ঢোকায়নি। শুধু একটা খবর পেয়েছি—মিরাণ্ডা স্ট্যানলিকে ছেড়ে চলে গেছে স্যানডিগোয়েতে তার বাবার বাড়িতে। আমি ইচ্ছে করলে মিরাণ্ডার বাসার ফোন নম্বর স্ট্যানলির কাছ থেকে নিতে পারতাম কিন্তু আমার রুচিতে বেধেছে। তাই তোমাকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করছি। সোজা হ্যাঁ অথবা না দিয়ে জবাব দাও—তুমি মিরাণ্ডার বাসায় থাকছ কি না।'
এটুকু বলতেই সাকিনার যেন বুক ফেটে গেল। মিরাণ্ডার সঙ্গে আছ কিনা বলতে চেয়েছিল কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারল না।
ফোনের ওপাশে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। এ পাশে সাকিনাও মুখ খুলতে পারছে না, কারণ মুখ খুললেই কান্নার স্রোত বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে। হঠাৎ সে রিসিভারটা আছড়ে ক্রেডলের ওপর রেখে বিছানায় ঝাঁপিয়ে উপুড় হয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। এবং একবার মাত্র কেঁদে উঠেই মুখে হাত চাপা দিল। নিচের ঘরে খালাম্মা আর জো মামী বসে আছেন। সে আঁচল মুঠ করে পাকিয়ে মুখে গুঁজে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কলটা পুরো ছেড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কান্নার দমকটা সামলাল। তারপর মুখে চোখে খুব করে পানি দিয়ে মুখ মুছল তোয়ালেতে। আয়নায় তাকিয়ে দেখল চোখ লাল হয়ে গেছে। সারা মুখে কান্নার ছাপ প্রকট। সে কেয়ার করল না। নিচে নেমে শান্ত গলায় বলল, 'চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।'
জোসেফিন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন সাড়ে বারোটা। চল

প্রথমে কোথাও গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে নিই। বুবু, তুমি বাইরে খেতে পারবে?'

'সুপ তো অবশ্যই পারব। তাছাড়া দেখব অন্য নরম খাবার আছে কি না। না হলে বাড়ি এসে আবার খাব।'

॥ ষোল ॥

'চাকরি কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো মামী। আপনার বান্ধবী খুব চমৎকার মানুষ। একেবারে নিজের ছোট বোনের মত করে দেখছেন।'

'বলেছিলাম না? সুরেখা কিন্তু এখনো ওর ছোট বোনটাকে মিস করে। ভালই হয়েছে।'

'কিন্তু মামী, আমাকে যে একটা ট্রেনিং নিতে টেক্সাস যেতে হবে? আমি তো কখনো—'

'আরে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। ওরাই তোমাকে প্রত্যেকটি ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে দেবে, কাগজপত্র রেডী করে সঙ্গে দেবে, প্লেনের টিকেট করে দেবে, টেক্সাসে হোটেল রিজার্ভ করে রাখবে আগে থেকেই। সেখানে এয়ারপোর্টে ওদের লোক এসে রিসিভ করবে। সব দেখবে একেবারে অংকের মত সোজা।'

সাকিনা শব্দ করে হেসে ফেলল, 'অংক বুঝি সোজা?'

'খুব সোজা। টেক্সাসের কোন শহরে? কতোদিনের ট্রেনিং?'

'ডালাসে। এক সপ্তাহের।'

'মা—এ এক সপ্তাহের? আরে ছোঃ! এর জন্য তুমি এত ঘাবড়াচ্ছো? দুর। দুর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুমি পলক ফেলবার আগেই দেখে যাবে ট্রেনিং শেষ করে ফিরে এসে গেছ!'

ফোন রেখে দিয়ে সাকিনা খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে ভাবল। জোসেফিন সব সময় উৎফুল্ল আশাবাদী। অথচ এঁর এমন হাঁপানী আছে যে মাঝে মাঝে ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাংঘাতিক কোন অসুখওয়ালা মানুষরাই কি এইরকম উৎফুল্ল আশাবাদী হয়? খালাম্মাকেও তাই দেখছে।

এইরকম ঘাতক ব্যাধি বহন করেও তিনি সবসময় উৎফুল্ল, আশাবাদী। না, সবসময় না। খালাম্মাও মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়েন, কান্নাকাটি করেন, তখন সাইফ, ফ্রিডা, জোসেফিন, শামু—সবাই মিলে ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে চাঙ্গা করে তোলেন। সাকিনাও ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। খালাম্মার মত মানুষ যিনি সাকিনাকে এত সাহস দিয়ে দিয়ে চাঙ্গা

রেখেছেন, তিনি যখন ভেঙ্গে পড়েন, তখন তাঁকে সাহস দিতে গিয়ে সাকিনারও নিজেকে খুব শক্ত মানুষ, শক্তিশালী মানুষ বলে মনে হয়। নিজের মনোবল বেড়ে যায়। নিজের ওপর আস্থা বেড়ে যায়।

আবার ফোন বাজল। রকিবের চাচা শিকাগো থেকে ফোন করেছেন। রকিবের ক্যালিফোর্নিয়া যাবার কথা উনি জানতেন না। গতকালই মাত্র রকিব ওকে ফোন করে জানিয়েছে। সাকিনা ফোনে 'হ্যালো' বলা মাত্র চাচা বকাবকি শুরু করলেন, 'তোমরা আজকালকার ছেলে-মেয়েরা এমন স্বাধীনচেতা হয়েছ একটা ডিসিশান নেবার আগে মুরুব্বিদের জানানো দরকার মনে কর না। রকিব যে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে প্র্যাকটিস করতে চায়, সেটা তো তার আমাকে আগে জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল। সে না করুক, তুমিও তো ফোন করে শুধু খবরটা আমাকে দিতে পারতে।'

সাকিনা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। চাচা তিনি রকিবের, নিজেও ডাক্তার, বিশ বছর এদেশে আছেন, রকিব যদি তাঁর পরামর্শ না চায় সাকিনা কি করতে পারে? তিনিও তো প্রতি সপ্তাহে ফোন করে যোগাযোগ রাখেননি।

চাচা বলেই চললেন, 'আর তোমাকেও বলিহারি যাই বাপু। স্বামীকে বশ করে নিজের কবজায় রাখতে পার না! কোন আক্কেলে ছেড়ে দিলে?'

সাকিনা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। চাচা এসব কি বলছেন? তাও বহুদিন পর হঠাৎ ফোন করে? আর এমন অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগ। প্রাণপণে গলা নম্র রেখে বলল, 'চাচা এসব কি বলছেন? আপনারা তো আগে আমাকে কখনো কোন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে সতর্ক করেননি? কখনো তো হিন্টসও দেননি যে রকিবকে বশ করে কবজা করে রাখার দরকার আছে? আজ হঠাৎ আমাকেই দোষ দিচ্ছেন?'

চাচা অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, 'এই তো—বলতে না বলতেই পাল্টা জবাব। তোমারও বাপু একগুয়েমি জেদ কম নেই। সে তো মিশিগানে থাকতেই দেখেছি। একটু মানিয়ে যাচিয়ে চলতে পার না? ট্যাক্ট ডিপ্লোম্যাসি কমপ্রোমাইজ—এসব কথার মানেগুলিও বোধহয় কখনো শেখনি।'

'চাচা, আপনি না হক আমাকে দোষারূপ করবেন না। আপনাদের ছেলের সব কীর্তি আমি জেনে গেছি। স্ট্যানলিই আমাকে জানিয়েছে। স্ট্যানলিকে নিশ্চয় চেনেন? রকিবের আম্মা যখন মিশিগানে এসেছিলেন, তখন তো আপনার বাড়িতেই ছিলেন। রকিব, স্ট্যানলি

উইকয়েণ্ডগুলো আপনার বাড়িতেই কাটিয়েছে। কথাবার্তা, বাকবিতণ্ডা, রকিবের মতিগতি ফেরানোর সবরকম চেষ্টায় স্ট্যানলিও ছিল।'

চাচা হঠাৎ যেন চুপসে গেলেন, সাকিনা হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে গেলেও তিনি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপর বললেন, 'মা গো। বুড়ো মানুষের দোষ নিয়ো না। তোমার ওপর আমাদের খুব ভরসা ছিল। তা স্ট্যানলি তো শুনেছিলাম মিরাণ্ডাকে বিয়ে করে মিশিগান থেকে চলে গিয়েছিল। ও আবার জুটলো কোত্থেকে?'

সাকিনা প্রাণপণ চেষ্টায় গলা সহজ রেখে স্ট্যানলি-মিরান্ডার মিশিগান ফেরা থেকে আবার মিরান্ডার স্যানডিয়েগো চলে যাওয়ার সব ঘটনা চাচাকে বলল।

চাচা খুব বিচলিত গলায় বললেন, 'এতো ভারি সর্বনাশ হল দেখছি! এখন রকিবকে ঐ ডাইনীর হাত হতে মুক্ত করা যায় কি করে? তুমি কি স্যানডিয়েগোতে চলে যাবে?'

সাকিনা শান্তগলায় বলল, 'চাচা, মিরান্ডা মোটেও ডাইনী নয় সে খুব ভাল মেয়ে। রকিব যখন ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, আপনাদেরই উচিত ছিল তাতে মত দেয়া। কতো বাঙ্গালী ছেলে বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে সুখে ঘর করছে না? আর আমি স্যানডিয়েগো চলে গিয়ে কি করতে পারি? সে তো ঝোঁকের মাথায় কিছু করেনি। খুব ভেবে চিন্তে প্রতারণার প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক করেই স্যানডিয়েগো গিয়েছে।'

চাচার কন্ঠস্বর খুব হতবুদ্ধি শোনাল, 'তুমি এখন কি করবে?'

'আমি আপাততঃ একটা চাকরি নিয়েছি। দেখি কি করব। চাচা, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট। দেশে কাউকে এখন কিছু জানাবেন না।'

'তাই ভালো। দেশে কাউকে এখন না জানিয়ে দেখ কিছুদিনের মধ্যে রকিবের মতিগতি ফেরানো যায় কি না চেষ্টা চরিত্র করে।'

'কে চেষ্টা চরিত্র করবে? আমি? মরে গেলেও না। ঐ মিথ্যেবাদী প্রতারকের সঙ্গে মরে গেলেও আমি আর ঘর করব না।'

'দেখ, দেখ, পাগলী মেয়ের রাগ দেখ। তা রাগ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মা জীবনটা তো আর—'

সাকিনার সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কান্নার ঢেউ উথাল-পাতাল করে উঠল, সে চাচার কথার মাঝেই ফোন রেখে দিয়ে সেখানেই মেঝেতে বসে পড়ল। মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। রকিব, রকিব, এ তুমি কি করলে? এখনো তোমার জন্য আমার সমস্ত দেহ-প্রাণ-মন উন্মুখ হয়ে রয়েছে, রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুধু তোমারই

বাহুবন্ধনের কথা, তোমার হাজারটা আদর সোহাগের কথা মনে হয়ে আমার ঘুম আসে না। কিন্তু তবু, তবু আর আমি তোমার বাহুবন্ধনের মধ্যে ফিরে যেতে পারব না। তুমি একটি সরল অসহায় মেয়েকে পেছন থেকে অতর্কিতে তীর দিয়ে বিধেছ। ঐ মেয়ে আর তোমার জন্য বেঁচে উঠবে না। ঐ তীরের যন্ত্রণায় সে চির জীবন ছটফট করবে কিন্তু তুমি হাজার চাইলেও আর তাকে বাঁচাতে পারবে না, আর তাকে আগের মত ফিরে পাবে না। না না কিছুতেই না। কখনই না।

দরজার বেল বাজল। রান্নাঘরের দেয়ালে ঝোলানো এই ফোনটার পাশেই পেছন দিকের দরজা। সাকিনা চমকে মুখ তুলে দেখল, দরজার কাঁচের ওপাশে জাহানারার চেহারা। চোখ না মুছেই সে দরজা খুলে দিল।

'এই যে মেয়ে, আবার তুমি মন খারাপ করে কাঁদছিলে?'

সাকিনা তাঁকে বলল চাচার সঙ্গে তার ফোনের কথাবার্তা এবং তার নিজের প্রতিক্রিয়া।

'তুমি এখনো রকিবকে ভালবাস। তাই না?'

'বাসি। কিন্তু ওর কাছে আর ফিরে যেতে পারব না কিছুতেই।'

জাহানারা ওর হাত ধরলেন, 'তুমি না চাইলে কেউ তোমাকে বাধ্য করবে না।'

আবার ফোন বাজল। চাচা আবার ফোন করছেন, কাতর গলায় বললেন, 'মা গো, তোমার এই বুড়ো ছেলেটাকে ক্ষমা কর। আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দেই তোমার নামে?'

'না, না, চাচা, তার দরকার হবে না। আমি একটা চাকরি করছি। তাছাড়া ব্যাংকে এখনো বেশ কিছু টাকা আছে। গাড়িটা রকিব রেখে গেছে, গাড়ি চালাতে শিখেছি—কোন অসুবিধে নেই। আপনি ভাববেন না।'

'কিন্তু কথা দাও, দরকার হলে বলবে?'

'বলব চাচা।'

ফোন রেখে সাকিনা জাহানারাকে বলল চাচা কি বলেছেন আর সে কি জবাব দিয়েছে। 'আমি উনার কাছ থেকে কিছুতেই সাহায্য নেব না। খালাম্মা, আপনার সাথে আমার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে একটু আলাপ করতে চাই। যা মাইনে পাই, তাতে এত ভাড়ার বাসা রাখা একটু অসুবিধে। তাছাড়া বাসাটা আমার পক্ষে বেশ বড়ও। এক বেডরুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট সস্তায় পেলে ভালো হত।'

'শোনো এই কন্ডো ছেড়ে তুমি যেয়ো না। তুমি খেয়াল করেছ কিনা

জানিনা এই কন্ডোমিনিয়াম কমপ্লেক্সের যে এসোসিয়েশান সেটা চালায় এই সব কন্ডোর মালিকরাই। অবৈতনিক সোস্যাল সার্ভিস বলতে পার। তার ফলে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে বেশ ভালো সমঝোতা আছে, সবাই সবাইকে চেনে, একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসে। অ্যাপার্টমেন্টগুলোরও অফিস আছে। কেয়ার-টেকার আছে। তারা সবাই মাইনে-করা। অ্যাপার্টমেন্টের সবাই ভাড়াটে। তাই ভাড়াটাদের বেশির ভাগই কেউ কাউকে চেনে না। এখানে বেশীর ভাগ লোক কন্ডো কিনেছে। ভাড়াটে খুব কম। তোমার মত দু-চারজন মাত্র। এখানকার সবার সঙ্গে তোমার বেশ জানাশোনাও হয়ে গেছে। তোমার মনের এই অবস্থায় নতুন জায়গায় গিয়ে আরো খারাপ লাগবে। তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন? অন্য একটি সিঙ্গল মেয়েকে তোমার বাসায় রাখ। দুজনে ভাড়া শেয়ার করলে খরচও কম হবে তোমারও অত একলা লাগবে না।'

'মন্দ কি? কিন্তু তেমন মেয়ে আমি কেমন করে খুঁজব?'

'তোমাকে খুঁজতে হবে না। আমি ফ্রিডা, জো, ডাই, লীনা—সবাইকে বলে রাখব। অনেক সিঙ্গল মেয়ে এভাবে শেয়ারে থাকতে চায়। দেখবে শীগগীরই একটা খোঁজ পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু খালাম্মা, রান্নাঘর তো একটা। বাথরুমও।'

'শোনো মেয়ে, বিলেতে আমেরিকায় একই বাড়িতে তিন চারজন আলাদা আলাদা ভাড়াটে থাকে, তাঁরা সবাই নিজের নিজের সুবিধে মত একই রান্নাঘর ব্যবহার করে, একই বাথরুম ব্যবহার করে, কোন ঝগড়াঝাটি কথা কাটাকাটি হয় না। এ দেশের লোকেরা এভাবে থেকে অভ্যস্ত। দেখবে, তোমার কোন অসুবিধে হবে না।'

॥ সতের ॥

সাকিনার সঙ্গে এক বাসায় থাকার জন্য যে মেয়েটি আসবে, সে নাকি কালো মেয়ে। শুনে সাকিনা প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু জো আর ফ্রিডা বলল, ও মেয়েকে তারা আগে থেকে চেনে। খুব ভালো মেয়ে। সাকিনার ভয় করার কোন কারণ নেই। কোন ঝামেলা হবে না। ফ্রিডা বলল, 'তোমার দুটো বাড়ির পরের বাড়িটাতে যে এক কালো পরিবার থাকে, দেখনি তাঁরা কত ভদ্র? বেন আর রিভা। ওদের ছেলে অ্যাডেলকে তো সব সময় বাইরে সাইকেল চালাতে দেখ।'

সাকিনা স্বীকার করল, অ্যাডেলের সঙ্গে তার ইতিমধ্যেই বেশ ভাব হয়ে গেছে। খুব মিশুক ছেলেটা। নিজেই সেধে সেধে সবার সঙ্গে আলাপ

করে।

বেটিনা প্রথম দিন একাই এল তার লাল রঙের বিরাট গাড়িটা চালিয়ে। বুটি থেকে দুটো ঢাউস স্যুটকেস একাই এক এক ঝটকায় তুলে বের করে দু'হাতে দু'টো ঝুলিয়ে গটগট করে বাসায় ঢুকল। সাকিনা তাকিয়ে দেখল, কালো হলেও মেয়েটি অপূর্ব শ্রীময়ী। বেশ লম্বা পাতলা ছিপছিপে অথচ পুরন্ত যৌবন-উছলানো শরীর, চুলগুলো সোজা। দুই ভ্রু ঢেকে কানের পাশ দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে। গলার স্বর একটু মোটা কিন্তু হাসিটি ভারি মিষ্টি। সে বাসায় ঢুকেই সাকিনার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল। সাকিনার মন থেকে ভয়, ভীতি, উদ্বেগ দূর হল। সে বেটিনাকে খুব পছন্দ করে ফেলল। মন বলল, এই মেয়ে বাসায় থাকলে তার সময় ভালোই কাটবে। সে বলে উঠল, 'খেয়াল করেছ তোমার নামের সঙ্গে আমার নামের কেমন মিল? সাকিনা আর বেটিনা?'

বেটিনা হা হা করে হাসল, 'তাই তো। বেশ ভালই হল। তাহলে তোমার সঙ্গেও আমার বনবে ভাল।'

সাকিনা তার আগের মাস্টার বেড রুমটাই রেখেছে। বেটিনার জন্য একটু ছোট দ্বিতীয় বেডরুমটা। কণ্ডোর ভাড়া, গ্যাস, পানি, ইলেকট্রিসিটির খরচ—সব আধাআধি।

'তোমার গাড়িটা কি বিরাট। এই কণ্ডো-কমপ্লেক্সে এত বড় গাড়ি কারো নেই।'

'জানো না বুঝি, কালোরা সব সময় বিরাট বিরাট গাড়ী কেনে?'

'তাই নাকি? ওরা বুঝি খুব বড়োলোক?'

'ঠিক উল্টো। ওরা গরীব বলে হীনমন্যতায় ভোগে। তাই সুযোগ পেলেই অন্য দিকের খরচ বাঁচিয়ে বিরাট বড় গাড়ি কেনে।' তারপর এক চোখ টিপে যোগ করল, 'অবশ্য সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, থার্ডহ্যাণ্ড গাড়ি।'

'বড় গাড়িতে তেল নাকি বেশী খায়?'

'তা খায়। কিন্তু স্ট্যাটাস সিম্বল। ওইটে উঁচু করে রাখার জন্য অন্য দিকে খরচ সংক্ষেপ করতে হয়। সেটা বেশির ভাগই বাড়ি এবং খাওয়া-দাওয়ার ওপর দিয়ে যায়।'

সাকিনা অবাক হল, কি আশ্চর্য দিল-খোলা মেয়েটি। নিজেদের সমাজের দোষ-মন্দ-কথা সব অকপটে বলে দিচ্ছে। সে ভাবল, আর যারই থাকুক, এর অন্ততঃ হীনমন্যতা রোগ নেই।

'কিন্তু আমি তো দেখেছি, নিগ্রো মেয়েরা খুব মোটা হয়। খাওয়া সংক্ষেপ করলে মোটা হতে পারে?'

বেটিনা হাসতে হাসতে হাল্কা সুরে বলল, 'খবরদার, কক্‌খনো নিগ্রো

বলবে না। বলবে কালো। কা—লো। বুঝেছ?'
সাকিনা খুব বিব্রত হয়ে পড়ল, 'দুঃখিত। আমি জানতাম না।'
'তাতে কি? আর শোন, ঐ যে মোটা হবার কথা বললে, ব্যালান্সড বা হাই-প্রোটিন খাবারের খরচ বেশি। কিন্তু কম খরচে রুটি, কেক, কুকিজ, ম্যাকারনি, স্প্যাগেটি দিয়ে পেট ভরানো সহজ। তাই কার্বো-হাইড্রেট বেশী খেয়ে কালোরা মোটা হয়ে পড়ে। ওটা কিন্তু সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।'
বেটিনা বিছানার ওপর রাখা খোলা সুটকেস থেকে এক এক করে কাপড় বের করে ক্লোজেটের হ্যাঙ্গারে ঝোলাতে ঝোলাতে কথা বলছে। সাকিনা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা শুনছে এবং কথা বলছে।
'তুমি কিন্তু মোটা নও। তোমার ফিগারটা দুর্দান্ত সুন্দর।'
বেটিনা হাসল, 'থ্যাংক ইউ ভেরিমাচ। আমি গরীব নই, আমি রেজিস্টার্ড নার্স, প্রচুর পয়সা কামাই করি। হাই-প্রোটিন ডায়েট খাবার সঙ্গতি আমার আছে। গাড়িটাও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নয় কিন্তু। ব্র্যাণ্ড নিউ।'
সাকিনা এবার ভাবল, মেয়েটা বেশ অহংকারীও বটে। সে বলল, 'তুমি তো নিজেই একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারতে।'
বেটিনা আবার হাসল, 'তা পারতাম। তবে বাসা খুঁজতেও সময় লাগে তো। ইতিমধ্যে আমার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল কিনা। ওর সঙ্গে ওর বাসাতেই ছিলাম। রাগের মাথায় বেরিয়ে এসে মোটেলে উঠেছিলাম। এমন সময় তোমার এই বাসার খবরটা পেলাম। ভাবলাম আপাততঃ মন্দ কি?'
'আপাততঃ মানে? তুমি শীগগীরই বাসা খুঁজে চলে যাবে নাকি?'
'না, না, তোমাকে অসুবিধেয় ফেলে হুট করে চলে যাব না।' তারপর মুখটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত করে বলল, 'পুরুষ মানুষে অরুচি ধরে গেছে, আপাততঃ কিছুদিন মুক্ত বিহঙ্গের মত জীবন যাপন করব।'
খালি হয়ে যাওয়া স্যুটকেস বন্ধ করতে করতে বেটিনা আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'নো ম্যান, নো ডেটিং। নাথিং অ্যাট অল।'
বেটিনার জীবন বৃত্তান্ত এবং জীবন দর্শন পরিপাক করতে সাকিনার একটু সময় লাগে। এদেশে আসার আগে সে পাশ্চাত্যের সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানত না; ঢাকার যে একটা আলট্রামডার্ন সমাজের ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে থাকে, তাদের সঙ্গেও তার কখনো যোগাযোগ ঘটেনি। এদেশে এসেও রকিবের পক্ষপুটে থেকে, যাকে বলে 'কালচারাল শক'—সেটা সে ঠিক পায়নি। এখন এই মাস দুয়ের মধ্যেই আমেরিকার 'কালচারাল শক' তাকে সত্যি সত্যি বিদ্যুস্পৃষ্ট করে ফেলেছে। এটা চরমে উঠল সপ্তাহ দুয়েক

পর। এক বুধবারে বেটিনা বলল, 'সাকিনা, এই শনিবার সন্ধ্যায় কণ্ডোটা একটু ছেড়ে দিতে হবে।'

সাকিনা অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

'তুমি পাঁচটা থেকে ধরো বারোটা পর্যন্ত বাইরে কোথাও কাটাবে। ঐ দিন আমার নতুন বয়ফ্রেণ্ডকে বাসায় ডিনারে দাওয়াত করতে চাই।'

সাকিনা হতভম্ব হয়ে বলল, 'এসব কি বলছ? তোমার বয়ফ্রেণ্ডকে দাওয়াত করবে, করো। তাতে আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে কেন?'

বেটিনা হাসিমুখেই ভুরু দুটো কুঁচকে বলল, 'তুমি কি কচি খুকী নাকি গো?' তারপর পরিহাস তরল গলায় বলল, 'তুমি যেদিন বাসায় বয়ফ্রেণ্ড আনবে, আমিও সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকবো।'

সাকিনার মাথা ঘুরতে লাগল, সে দিশে না পেয়ে হঠাৎ দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল ফ্রিডাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

জাহানারা বাসাতেই ছিলেন। সব শুনে বললেন, 'এত অস্থির হোয়ো না। যে দেশের যা কালচার। এদেশে এসব ডাল ভাত। ফ্রিডা আসুক। তারপর একটা কিছু পরামর্শ করা যাবে। তবে মেয়েটা এমনিতে কিন্তু ভাল। সিগারেট খায় না। মদ খায় না। ফ্রিডা, জো বিশেষ করে ঐ রকম টিটোট্যালার দেখেই ওকে তোমার বাসায় রাখার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। মদ-সিগারেট খাওয়া মেয়ে হলে আরো ঝামেলা হতে পারত। বয়ফ্রেণ্ড থাকা এদেশে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। ওটা একটু মেনে নিতেই হবে।'

ফ্রিডা ও জোর মধ্যস্থতায় একটা রফা হল। বেইসমেন্টটা একেবারে খালি পড়ে থাকে। ওটাকে একটা লিভিং রুম বানানো হবে। খরচ যা হবে, বেটিনা সাকিনা দু'জনে হাফ হাফ দেবে। বেটিনা যখনই বয়ফ্রেণ্ড বাসায় আনুক, ডিনার সারার পর ওরা বেইসমেন্টে চলে যাবে। আর এই শনিবারে ফ্রিডা সাকিনাকে দাওয়াত করল ডেট্রয়েটে গ্রীক-টাউনে ডিনার খাওয়ার। দাওয়াতটা আসলে ফ্রিডার বাবা-মাই করছেন ফ্রিডা, জামী ও জাহানারাকে। ওঁরা সাকিনাকেও সঙ্গে নিতে বলেছেন। ফ্রিডার আদি দেশ গ্রীস। ওরা মাত্র দুই পুরুষে আমেরিকান। ফ্রিডার দাদা তাঁর যৌবনে গ্রীক বউসহ এদেশে ইমিগ্রান্ট হয়ে আসেন। ফ্রিডার বাবার জন্ম এদেশে। কিন্তু ফ্রিডার মা তাঁর ষোল বছর বয়সে গ্রীক থেকে আসেন। আসলে ফ্রিডার বাবার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যই তাঁকে গ্রীস থেকে আনানো হয়। ওদের বাড়িতে এখনো অনেক গ্রীক ধরন-ধারন আছে। ফ্রিডার মা বাড়িতে বেশির ভাগ সময় গ্রীক পদ রান্না করেন। ডেট্রয়েটে গ্রীক-টাউনে অনেক গ্রীক রেস্তোরাঁ আছে।

সেখানে ডিনার সারার পর ওরা যাবে নদীর ধারের এথনিক ফেস্টিভ্যাল দেখতে। প্রতি বছর এই সময় ডেট্রয়েটে নদীর ধারে বিশাল লম্বা চওড়া খোলা জায়গাতে বিভিন্ন দেশের ইমিগ্রান্টরা তাদের নিজ দেশীয় শিল্প সংস্কৃতিমূলক স্টল খোলে। এসব দেখে ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা একটা বেজে যাবেই।

বেটিনা মেয়েটি সত্যিই ভালো। ওর বয়ফ্রেণ্ড বাড়িতে আনার ব্যাপারে সাকিনা এই রকম কান্ড করলেও ও মাইন্ড করেনি। বরং এই নিয়ে সাকিনাকে ঠাট্টা করে ক্ষেপিয়েছে। সাকিনা হেসে বলে, 'বা রে! তুমিই বা কেমন। প্রথমে এসেই ঘোষণা দিলে বেশ কিছুদিন পুরুষের মুখ দেখবে না। নো ম্যান, নো ডেটিং। তা দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই—'

'বারে, দু'সপ্তাহ কম সময় হল? ওতো অনেক দিন। অতদিন যে ধৈর্য ধরে থাকতে পেরেছি, তোমার তো আমাকে সাধুবাদ দেয়া উচিত।'

।। উনিশ ।।

জাহানারার ঢাকা ফিরে যাবার দিন ঠিক হয়ে গেছে—অক্টোবরের পাঁচ তারিখ। জামী ফ্রিডার মন খারাপ, সবচেয়ে বেশি মন খারাপ সাকিনার। সে বারবার করে বলেছে: 'খালাম্মা, আপনি চলে গেলে আমি খুব নিঃসহায় হয়ে যাব।'

জাহানারা চোখ পাকিয়ে বলেছেন: 'কেউ কারো জন্য নিঃসহায় হয়ে যায় না। খবরদার এই কথাটা ভুলবে না। আর, কখনো কারো ওপর নির্ভর করবে না, নিজের দু'পায়ে ভর দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। তাহলেই দেখবে আর কখনো দুঃখ পাবে না।' তারপর হেসে ফেলে সাকিনার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেছেন: 'গায়ের জোরে ভালো থাকতে হবে। বুঝেছ?'

এখন একা একা বসার ঘরের সোফায় বসে উদাস চোখে খেলার মাঠের দিকে তাকিয়ে সাকিনা এইসব কথাই ভাবছিল। গায়ের জোরে ভালো থাকতে হবে। কি উদ্ভট কথা!

পেছন দিকের দরজা খুলে কখন বেটিনা ঘরে ঢুকেছে সাকিনা খেয়াল করেনি। হঠাৎ চমকে উঠল ওর গলা শুনে 'এই মেয়ে আবার মন খারাপ করে বসে আছ।'

সাকিনা ওকে দেখে খুশী হল। একা থাকলেই যত চিন্তার ভূতগুলো এসে বুকে চেপে বসে। এখন অন্ততঃ ঘুমোনোর আগে পর্যন্ত সময়টা ভাল কাটবে। বলল, 'খালাম্মা দেশে ফিরে যাচ্ছেন শীগগীর। উনি চলে গেলে আমি খুব একা হয়ে যাব। তাই ভাবছিলাম।'

'কেউ কারো জন্য একা হয়ে যায় না। এসব মানুষের বিভ্রান্ত বিশ্বাস। নোবডি ইজ ইন্‌ডিস্‌পেনসিবল্‌ ইন দিস ওয়ার্ল্ড।'

সাকিনা তর্কের দিকে এগোল না। বেটিনা খুব তর্ক করতে পারে। অবশ্য ওর সঙ্গে তর্ক করে সাকিনাও মাঝে মাঝে খুব চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ওর মাথার ধোঁয়াটে ভাব-ভাবনাগুলো খুব স্পষ্ট আকৃতি পায়। কিন্তু আজ সেটা এড়িয়ে অন্য কথা বলল, 'আমি আগামীকাল খুব ভোরে ফ্রিডাদের সঙ্গে স্ট্র্যাটফোর্ডে যাচ্ছি। ফিরতে রাত এগারোটা হবে। তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ডকে সারাদিনের জন্য দাওয়াত করতে পার।'

'স-ত্যি? তুমি সারাদিন থাকবে না? ওঃ, হাউ নাইস অব ইউ! আমি এক্ষুণি হাওয়ার্ডকে ফোন করে দেখি—ও আবার কাল সকালে গলফের প্রোগ্রাম করে না ফেলে।'

ফোন করে বেটিনা হাসিমুখে ফিরে এল, 'নাঃ, কালকে ওর কোন প্রোগ্রাম নেই। সকাল দশটাতেই চলে আসবে। স্ট্র্যাটফোর্ডে কেন?'

'ওখানে প্রতি বছর সামারে আর ফল-য়ে শেকসপীয়ারিয়ান ড্রামা ফেস্টিভ্যাল হয়। ওখানে তিনটে থিয়েটার হল আছে। জুন থেকে অক্টোবর প্রতি সপ্তাহে তিন চারদিন করে শেকসপীয়ারের নাটক হয়। ফ্রিডারা প্রতি বছর একদিন যায়। একটা নাটক দেখে আসে। এবার আমাকেও ওদের সঙ্গে যেতে বলেছে।'

বেটিরার মুখ দেখে মনে হল এ বিষয়ে ওর বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। সাকিনা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোনদিন যাওনি?'

বেটিনা কাঁধ ঝাঁকাল, 'আমি বিশেষ জানি না এ সম্বন্ধে। দেশের কতো জায়গাতে কতো রকম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে—সারা বছর লেগেই রয়েছে। যার যেটায় আগ্রহ, সে শুধু সেইটের খবরই রাখে। আমার নেশা হল জ্যাজে—যেখানে জ্যাজের কোন অনুষ্ঠান—হাওয়ার্ড আর আমাকে সেখানে পাবেই।'

'শোনো, আমার ফোন এলে মেসেজগুলো রাখবে কি দয়া করে?'

'অবশ্যই।'

'কেমন এনজয় করলে শেকসপীয়ারের ড্রামা?'

'উঃ! অপূর্ব। শুধুতো নাটকই নয়—এই যে যাওয়া, দুপুরে পার্কের টেবিলে বসে খাওয়া, আড়াইটের শোতে নাটক দেখে সন্ধ্যেয় একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়া—সবটা মিলে চমৎকার একটা পিকনিকের মত। আমার যা ভালো লেগেছে না। কি বলব! আর জায়গাটা যা সুন্দর। থিয়েটার হলগুলো ঘিরে ফুলের বাগান, পার্ক, লেক—কতো কি।'

'খুশী হলাম এনজয় করেছ শুনে। ও হ্যাঁ, দুজন মানুষে কাল তোমাকে পাঁচবার ফোন করেছে।'

'কি রকম? দুজন মানুষে পাঁচবার? নিশ্চয় একেকজনে আড়াইবার করে নয়?'

বেটিনা ঘরের ছাদ ফাটিয়ে হো হো করে হাসল, 'বাঃ, এই তো তোমার সেন্স অব হিউমার বেশ ডেভেলাপ করছে। না, আড়াইবার করে নয় —একজন মাত্র একবার, অন্যজন চারবার। এই যে কাগজটায় নাম লেখা আছে।'

বেটিনার বাড়ানো কাগজটায় চোখ পড়তে সাকিনার হৃৎপিণ্ড একবার লাফিয়ে উঠেই যেন অকস্মাৎ থেমে গেল। রকিব ফোন করেছিল! এতদিন পরে! পরের চারবার, স্ট্যানলি করেছে! কেউ কোন মেসেজ রাখেনি।

'তবে তোমার ঐ রো-কিব ও কিন্তু আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করছিল। আমি কে, কবে থেকে আছি, কি করি, এসব। আর ঐ যে স্ট্যানলি, ওতো চারবার ফোন করেছে। একবারও কোন মেসেজ দেয়নি। তোমার ফিরতে রাত এগারোটা হবে জেনেও কেন যে বারবার ফোন করছিল, তা বোঝা গেল না। ওকি তোমার বয়ফ্রেণ্ড? ঝগড়াঝাঁটি করেছ নাকি?'

সাকিনা ভয়ানকভাবে চমকে সোজা হয়ে উঠে বসল, 'না, না; কি যে বল! আমার কোন বয়ফ্রেণ্ড নেই; তা তুমি জান না? স্ট্যানলিকে তুমি দেখেছ তো। এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছে; খোঁজ-খবর নিয়ে চলে গেছে। আমাদের ব্যবহার দেখে তোমার কি মনে হয়েছে স্ট্যানলির সঙ্গে আমার—'

'না, তা মনে হয়নি! তবে তুমিই বা এত ব্লাশ করছ কেন? এতদিন প্রেম ছিল না, এখন তো হতে পারে।'

সাকিনার মুখ টকটকে হয়ে উঠল, সে ক্রুদ্ধ কন্ঠে বলল, 'বেটিনা, আমি মোটেও ব্লাশ করিনি। তোমার অন্যায় কথায় রেগে গেছি। তুমি জান আমি ওরকম মেয়ে নই। আমার স্বামী আছে—'

বেটিনা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে চলে গেল। এই মেয়েটাকে সে মাঝেমধ্যে একেবারেই বুঝতে পারে না। ভীষণ রকম কমপ্লেক্স আর কনফিউশানে ভুগছে। স্বামী তাকে ছেড়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে চলে গেছে। সে স্বামীকে ঘৃণাও করছে, আবার তাকে ভুলতেও পারছে না। স্ট্যানলিকে দেখলেই বোঝা যায় সাকিনার জন্য জীবনটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে এক পায়ে খাড়া। অথচ সাকিনা সেটাকে এতটুকু স্বীকৃতি দিতে নারাজ। স্ট্যানলির সঙ্গে সহজ হতে পারলে

মেয়েটা কষ্ট কম পেত। জীবনটা এত ছোট, এই রকম কষ্ট পেয়েই যদি বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দেবে, তো আনন্দ পাবে কখন ; যাকগে তার কি ? সে সাকিনার মনের বিভ্রান্তি ঘোচাতে একটু সাহায্য করতে চেয়েছিল বই তো নয় !

বেটিনা রান্নাঘরে গিয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরির উদ্যোগ নিল, সাকিনা আস্তে আস্তে গিয়ে পেছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল, 'আয়াম সরি, বেটিনা তোমার মত বন্ধুকে আমার এত কড়া কথা বলা উচিত হয়নি। প্লীজ, রাগ কোরো না। বল, রাগ করনি।'

বেটিনা তার মধুর হাসি ঝলকে সাকিনাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মোটেই রাগ করিনি। তোমার টেনশানের সময় এইটুকু যদি সহ্য করতে না পারি, তাহলে আর বন্ধু কিসের ?'

ব্রেকফাস্ট শেষ হতে না হতে স্ট্যানলির ফোন এল। স্ট্যানলি তাকে জানাল মিরান্ডা ডিভোর্সে'র জন্য উকিলের চিঠি পাঠিয়েছে। সাকিনার বুক ধক্ক করে উঠল। গতকাল রকিব কেন ফোন করেছিল এতদিন পর ? কথাটা স্ট্যানলিকে বলতে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিছু আন্দাজ করতে পার, রকিব কি বলার জন্য ফোন করেছিল ?'

'না !'

'তোমাদের ডিভোর্সে'র নিয়ম কানুন কি রকম জানো কি ? তোমাদের বিয়ে তো বাংলাদেশে হয়েছে। এখানকার ডিভোর্স ল' অনুযায়ী কি এখানে তোমাদের ডিভোর্স হওয়া সম্ভব ?'

স্ট্যানলির কথাগুলো, সাকিনার বুকের মধ্যে কেটে বসতে লাগল। তার বুকটা যেন জমে হিম হয়ে যাচ্ছে। সে কোন মতে দম-চাপা স্বরে বলল, 'আমি কিচ্ছু জানি না স্ট্যানলি। আমি এ বিষয়ে এখন কোন কথাও বলতে চাইনে। আগে শুনি রকিব কি বলতে চায়।'

'তুমি রকিবকে ফোন করে জেনে নাও না, কেন সে গতকাল ফোন করেছিল।'

'কক্‌খনো আমি তাকে ফোন করব না। তার গরজ থাকলে সেই করবে।'

একটু পরে বেটিনা বলল, 'আমি গ্রোশারী করতে যাচ্ছি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?'

সাকিনার মনে পড়ল—তারও কাঁচা-বাজার করতে হবে। সাধারণতঃ রোববারে সকালেই সে খাবার-দাবার যা লাগে, কেনাকাটা করে। আজ কিন্তু বেরোতে মন চাইল না। যদি রকিব আবার ফোন ক'রে না পায় ? সে বলল, 'আমার এখন বেরোতে ইচ্ছে করছে না। তুমি কি প্লীজ আমার দু'একটা জিনিস কিনে এনে দেবে।'

বেটিনা হেসে বলল, 'সিওর। লিস্টি করে দাও।'
রকিবের ফোন এল ঘন্টা দুয়েক পরে। সাকিনা 'হ্যালো' বলার পর তার প্রথম কথাই হল, 'মেয়েটা কে? কবে থেকে তোমার সঙ্গে?'
'তা দিয়ে তোমার দরকার কি? আমার পক্ষে এতবড় বাসার একা ভাড়া টানা কষ্টকর, তাই শেয়ারে থাকার ব্যবস্থা করেছি।'
রকিব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ভাবছিলাম একবার মিশিগান যাব। তা বাড়িতে তো লোক বসিয়ে সে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছ।'
সাকিনা ভেবেই রেখেছে রকিবকে সে আজ একচোট দেখাবে। সে তীব্রস্বরে বলল, 'কেন, মিশিগানে মোটেলের অভাব নাকি? তাছাড়া তুমি কি করে ভাবতে পারলে তোমাকে আবার এ বাড়িতে ঢুকতে দেব?'
'কেন দেবে না। আমি তো এখনো আইনতঃ তোমার স্বামী।'
'আইন! কিসের আইন? তুমি যে অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করছ, সেটা কোন আইনে? মিরাণ্ডা স্ট্যানলির কাছে ডিভোর্সের নোটিশ পাঠিয়েছে, তুমি কি আমারটা হাতে হাতে দেবার জন্য মিশিগানে আসতে চাচ্ছ?'
এবার রকিবেরও গলা চড়ল, 'সাকিনা, তোমার খুব বাড় বেড়েছে। স্ট্যানলি তোমাকে এত খবর দেয় কেন? খুব বুঝি মেশামেশি চলছে?'
'চললে তুমি খুশী হও, না? স্ত্রীর ওপর চরিত্র দোষ আনার সুবিধে হয়। স্ট্যানলির ওপর রাগকরা কি তোমার সাজে? তুমি তার বউ ভাগিয়ে নিয়ে গেছ, তারই তো তোমাকে খুন করতে চাওয়ার কথা!'
রকিব আরো রেগে বলল, 'দেখ, ভুলভ্রান্তি মানুষেরই হয়, আমি ফিরে আসার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু তোমার এই রকম রণচণ্ডী মনোভাব দেখে বুঝতে পারছি—তোমার ইচ্ছে নেই মিটমাটের।'
রাগে দুঃখে সাকিনার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। মিটমাট করার কি সুন্দর প্রয়াস, কি মোলায়েম ভাষা-ভঙ্গী! সে চিৎকার করে বলল, 'তোমার লজ্জা করে না উল্টো দোষারোপ করতে? ডাণ্ডা বাড়ি মেরে মিটমাটের কথা? আসলে এসব তোমার ছল। তুমি সোজামুখে ডিভোর্সের কথা তুলতে ভয় পাচ্ছ, তাই উল্টো-পাল্টা কথা বলে আমার ওপর দোষ চাপিয়ে বাবা-মা চাচার কাছে ভালো মানুষ সাজতে চাইছ। আমি জানি এক্ষুণি তুমি চাচাকে ফোন করে সাতকাহন লাগাবে। তারপর চাচা আমাকে ফোন করে দোষ দেবেন আমার এক গুঁয়েমির জন্য, আমার বদ-মেজাজের জন্য বিয়েটা টিকল না, সংসারটা ভাঙল। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি রকিব আহমেদ, যদি বাপের বেটা হও; সোজাসুজি

নিজের দোষ স্বীকার করে নিজেই ডিভোর্সটা দাও। অন্ততঃ মিরাণ্ডার মত সৎ হও, ভান আর প্রতারণা ছাড়। তুমি তো মিরাণ্ডারও যোগ্য নও। তার ভেতর অন্ততঃ ভান আর মিথ্যাচার নেই। সে যে তোমার মত এমন একটা কুলাঙ্গারকে এখনো ভালবেসে বিয়ে করতে চাইছে, এইটাই তো আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকছে!' আর পারল না সাকিনা। ঠকাস করে ফোন রেখে দিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

কেঁদেই চলল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর চোখ মুছে ভাবল, 'এত কাঁদুনী মেয়ে হয়েছি কেন আমি? কাঁদবার কি আছে? এই তো কেমন উচিত কথাগুলো গুছিয়ে বলে দিয়েছি শয়তানটাকে। আমার তো নিজেকে বাহাদুরী দেওয়া উচিত। খুশী হওয়া উচিত এতটা পেরেছি বলে!'

কিন্তু কই? খুশী তো লাগছে না। বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। এত কষ্ট আছে পৃথিবীতে? এত কষ্ট করে বেঁচে থাকতে পারে মরণশীল মানুষ?

॥ আঠার ॥

আবার আরেকটা ফল সীজন এসেছে। গাছে গাছে পাতারা উজ্জ্বল লাল, হলুদ, কমলা, বাদামী রঙে নিজেদের রাঙিয়ে নিচ্ছে বিবর্ণ হয়ে ঝরে যাবার আগে। সেদিকে চেয়ে সাকিনা গুণগুণ করে উঠল, 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও—যাওগো এবার যাবার আগে—'

ফোন বাজল। সাকিনা বারান্দার চেয়ার থেকে উঠে বেডরুমে এল। ফোন তুলল, 'হ্যালো।'

স্ট্যানলির গলা, 'কি করছ শনিবারের সকালে?'

'কিছু না। বারান্দায় বসে বসে পাতাদের রঙ বদলানো দেখছি।'

'গলাটা বেশ খুশী খুশী লাগছে! খুব ভালো মুডে আছ মনে হয়?'

'হ্যাঁ। কাল রাতে মা'র সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। মা, বাবা, ভাই, বোন সবার সঙ্গে। সবার গলা শুনে মন খুব ভাল; জান সামনের সামারে মাকে টিকেট পাঠাবো। মা এসে তিন চার মাস বেড়িয়ে যাবেন ঠিক হয়েছে।'

'বাঃ, খুব ভাল খবর তো! সেলিব্রেট করা দরকার।'

সাকিনা হেসে ফেলল, 'তোমার স্বভাবটা আর বদলাল না। একটা কিছু হলেই সেলিব্রেট করার কথা।'

'মন্দটা কি দেখলে? তোমার কোন প্রোগ্রাম আছে আজ?'

'আছে, রাত্রে। ফ্রিডাদের বাসায়। জামী ভাই তার স্কুল জীবনের

এক বন্ধুর দেখা পেয়েছে হঠাৎ এই মিশিগানে। তাকে খেতে বলেছে। বাঙালীর সঙ্গে দেখা হবে, বাংলায় কথা বলব—এই খুশীতেও মুড খুব ভাল।'

'তুমি তো ভালই ইংরেজি বল। সত্যি বলতে কি অনেক আমেরিকানদের চেয়েও তুমি ভালো করে বোঝাতে পার। তা সত্ত্বেও বাংলায় কথা বলার জন্য এত আকুলতা?'

'ও তুমি বুঝবে না।'

'তা ছেলেটা কি ম্যারেড? না, ব্যাচিলর?

'ব্যাচিলর।'

'ব্যাচিলর! বাঃ; এতো আরো ভাল খবর।'

'কি আবোল তাবোল বলছ? তোমাদের কি কানু ছাড়া গীত নেই? মানুষের সঙ্গে মানুষ সহজভাবে মিশবে, ভাবের আদান প্রদান করবে, বন্ধুত্ব হবে—'

'ভাবের আদান-প্রদান করতে করতে, বন্ধুত্ব হতে হতেই প্রেম আসে। আমরা আমেরিকানরা সব ব্যাপারে রিসার্চ করি তো, এ ব্যাপারেও রিসার্চ করে করে আমরা এই সিদ্ধান্ত পেয়েছি। ফলাফল সর্বত্রই প্রায় একই হয়।'

'তা যদি হয় তো, দোষের কি। আপন দেশের ছেলে, একই সংস্কৃতির মানুষ।'

'দোষ কিছু নেই। শুধু আমার চান্সটা কমে যায়—এই যা।'

'ফাজলেমি হচ্ছে! তোমার মুখে আগ্‌ল নেই।'

'আমরা আমেরিকানরা সব সময় খোলাখুলি কথা বলতে পছন্দ করি। তা যাকগে, তোমার ব্লাইন্ড ডেট তো রাত্রে। এখন কি করছ?'

'কিছু না। তুমি ইচ্ছে করলে আসতে পার। আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে পার।'

'আমি এক্ষুণি আসছি।'

স্ট্যানলি এল অনেকক্ষণ পরে। তার হাতে পেট মোটা দুটো গ্রোশারী ব্যাগ। দরজা খুলে দিয়েই অবাক হয়ে সাকিনা বলল, 'এত কি কিনে এনেছ? সারা হপ্তার গ্রোশারী করেছ মনে হচ্ছে?'

ব্যাগ দুটো খাবার টেবিলে নামিয়ে স্ট্যানলি বলল, 'আমি আজ একটা নতুন জিনিস বানিয়ে খাওয়াব তোমায়। তাই কিছু উপকরণ কিনে আনলাম।'

'তুমি বানাবে খাবার জিনিস? জীবনে রান্না করেছ কখনো? তোমার বাড়িতে তো মেইড কুক—কত কি?'

'এ দেশের সব পুরুষকেই রান্না করতে হয় জীবনে কোন না কোন সময়ে। মেইড, কুক ওসব তো বাবার আমলের। বাবার স্ট্যাটাস সিম্বল ছিল ওগুলো। আমার ওসব লাগে না।'

'লাগে না তো রেখেছ কেন এখনো?'

সাকিনার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ স্ট্যানলি, 'কি জানি কেন রেখেছি।'

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে ব্যাগ থেকে খাবার জিনিসপত্র বের করতে লাগল স্ট্যানলি। 'তাছাড়া তুমি ভুলে গেছ, স্যানডিয়েগোতে দু'বছর আমি রান্নার হবি নিয়ে মেতে ছিলাম।'

'স্যানডিয়েগো!'

সাকিনার বুকের চার পাশ দিয়ে ব্যথা চিন চিন করে উঠল। মুখে কালো ছায়া ফেলল সেই ব্যথা। স্ট্যানলি সেটা লক্ষ্য করে অনুতপ্ত গলায় বলে উঠল, 'আয়াম সরি। পুরনো কথা মনে করাতে চাইনি।'

সাকিনা মুখ নিচু করে টেবিল থেকে পেয়াজ, টমেটো এগুলো নিয়ে কিচেন কাউন্টারে রাখতে লাগল। স্ট্যানলি হঠাৎ দুই হাতে সাকিনার দুই কাধ ধরে তার দিকে ফিরিয়ে বলল, 'এখনো ভুলতে পারনি?'

সাকিনার দুই চোখে পানি টলটল করে উঠল, 'না। শুধু মেনে নিয়েছি। মনে মনে ছেড়ে দিয়েছি। তাকে বলেছি ডিভোর্স পেতে যা যা দরকার কর। দিয়ে দেব। কিন্তু কষ্টের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কি এতই সহজ স্ট্যানলি?'

'তোমার আমার কষ্টের উৎস তো একই সাকিনা; আমরা কি দুজনে মিলে সেটা ভোলার চেষ্টা করতে পারি না?'

'তাই তো করছি স্ট্যানলি।'

স্ট্যানলির দুই চোখে আলো জ্বলে উঠল, সে সাকিনাকে আকর্ষণ করল তার দিকে। তার ঠোঁট এগিয়ে নিল সাকিনার ঠোঁটের দিকে।

ঘটনার এই আকস্মিক মোড়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না সাকিনা। সে হক-চকিয়ে দুপা পিছিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল স্ট্যানলির বাহুবন্ধন থেকে। এলোমেলো কন্ঠে বলে উঠল, 'আমি—আমি ঠিক এ কথা মীন করিনি স্ট্যানলি—'

'তাতে দোষ কি সাকিনা। আমরা দু'জনেই পোড় খাওয়া—দু'জনেই নিঃসঙ্গ। একে অন্যের সাহচর্যে দুঃখ ভোলার চেষ্টা—'

'না স্ট্যানলি আমাকে একটু সময় দাও। আমার মন এখনো ঠিক হয়নি। আমার শেকড়ে এখনো মাটি বসেনি। আমাকে একটু আত্মস্থ

হবার সময় দাও স্ট্যানলি। অন দ্য রিবাউন্ড আমি কিছু করতে চাইনে। এক ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেতে না পেতে দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে আমি কিছুতেই পড়ব না স্ট্যানলি। পণ করেছি।'

—০—

নববর্ষ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ
শুভেচ্ছা সহ
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড